POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (النساء:171)

হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমণ করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্‌র।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৭১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

সংখ্যা 11-12

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

18-25 মার্চ, 2021 ● 4-11 শাবান 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।

১১২৭) হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে তাঁর এবং রসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বলেন- 'তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে আছে; তিনি যেদিন ইচ্ছে করেন আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আমি একথা বললে তিনি ফিরে গেলেন, কোন উত্তর করলেন না। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নিজের ঊরু চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন- 'মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।'

রমযানে বা-জামাত নফল নামায

১১২৯) হযরত আয়েশা উম্মুল মোমেনীন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে মসজিদে নামায পড়লেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে নামায পড়ল। এরপর পর তিনি পরের দিনও পড়লেন আর এতেও অনেক লোক হল। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও অনেক মানুষ এল, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জন্য বাইরে আসলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন: তোমরা যা কিছু করছিলে তা আমি দেখে ফেলেছিলাম। আর আমি এই আশঙ্কায় তোমাদের মাঝে আসি নি যে পাছে তোমাদের জন্য (তাহাজ্জুদ) অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ঘটনাটি রমযানের মাসের।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৯ শে জানুয়ারী, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

মানুষের পরম আনন্দ, যার ক্ষয় নেই এবং যা তাকে বিপদের সময় রক্ষা করে, তা হল খোদার উপর নির্ভর করা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বার্তা

দোয়ার কল্যাণ

ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল খোদার উপর আস্থা রাখা। সেই ব্যক্তিই মুসলমান যে সদকা এবং দোয়ায় বিশ্বাসী। খৃষ্টানরা তো এতে বিশ্বাসী নয়, কারণ কি? কেননা তারা দেহবিশিষ্ট খোদা তৈরী করেছে। মানুষের পরম আনন্দ, যার ক্ষয় নেই এবং যা তাকে বিপদের সময় রক্ষা করে, তা হল খোদার উপর নির্ভর করা। আর খোদার উপর ভরসা করা কেবল মাত্র ইসলামেরই শিক্ষা।

মায়ের সেবা

মায়ের সম্মান করা মানুষের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। ওয়ায়েস কারনীর জন্য অনেক সময় রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইয়েমেনের দিকে মুখ করে বলতেন, আমি ইয়েমেনের দিক থেকে খোদার সৌরভ পাচ্ছি। তিনি একথাও বলতেন, 'সে তার মায়ের আজ্ঞাপালনে নিয়োজিত থাকে আর এই কারণেই সে আমার কাছেও আসতে পারে না। বাহ্যত এটি এমন বিষয় যেখানে খোদার পয়গম্বর (সা.) বিদ্যমান, কিন্তু তাঁর যিয়ারত করতে পারেন না, কেবল মায়ের সেবা ও আনুগত্যে মগ্ন থাকার কারণে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, রসুলুল্লাহ্ (সা.) কেবল দুই ব্যক্তিকেই সালাম পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। প্রথম ওয়ায়েস-কে, দ্বিতীয় মসীহকে। এটি অদ্ভুত বিষয় যা অন্যরা এমন বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয় নি। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যান, ওয়ায়েস তখন তাকে বলেন, 'আমি মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকি আর আমার উটগুলিকে ফিরিশতারা চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।' একদিকে আছে এই সব মানুষ যারা মায়ের সেবায় এমন সর্বস্ব ত্যাগ করেছে এবং গ্রহণীয়তা এবং সম্মান লাভ করেছে। অপরদিকে আছে সেই সব মানুষ যারা কয়েক পয়সার জন্য মুকাদ্দমা করে এবং মায়েদেরকে এমন নামে ডাকে, নিকৃষ্ট জাতি- মেথর, মুচিরা পর্যন্ত সেই ভাষা প্রয়োগ করে না। আমাদের শিক্ষা কি? কেবল আল্লাহ্ এবং রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র নির্দেশকে পৌঁছে দেওয়া! কেউ যদি আমার সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পর এই নির্দেশ মানতে না চায় তবে আমার জামাতে কেন আসে? এমন দৃষ্টান্ত অপরের বিপথগামিতার কারণ হয়। আর তারা আপত্তি করে যে এমন মানুষও আছে যারা মা-বাবার সম্মানও করে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৯-২৭০)

নিজের জামাতের মানুষের উপর একটা সীমা পর্যন্ত বল প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দিয়েও নামায ত্যাগকারী হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে তার কারণে যেহেতু জামাতের সুনাম হানি হয়, তাই আমাদের অধিকার বর্তায় এমন ব্যক্তির সংশোধনের জন্য তাকে বাধ্য করা।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৩৫ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

"যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান কর, তবে নিশ্চয় কর, কেননা তোমার এবং আমার মাঝে মতভেদ আছে। তোমার আর আমার কর্ম ভিন্ন। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষের অধিকার আছে অপর পক্ষের কথাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করা। কিন্তু বিষয়টি এতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। একে অপরকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য বা মতবাদ মানতে বাধ্য করা উচিত নয়। তাই আমি যখন তোমাদেরকে বাধ্য করছি না, তবে তোমরা কেন আমাকে বাধ্য করছ?

প্রথম আয়াতে যে اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ বলা হয়েছিল, এই আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যেহেতু তোমার এবং আমার জামাত ভিন্ন ভিন্ন, তোমাদের ও আমাদের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন আর একথা সর্বজনবিদিত, সেক্ষেত্রে কলহ ও বলপ্রয়োগ পর্যন্ত বিষয়টি কিভাবে গড়ায়? কেননা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন তখন দেখা দেয়, যখন একের কারণে অন্যের ক্ষতি হয়। কিন্তু এখানে আমার এবং আমার জামাতের কাজের কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে না। তোমাদের কাজের কারণে আমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে না। কাজেই বল প্রয়োগ অবৈধ।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে স্বজাতির কোন ব্যক্তির উপর একটা সীমা পর্যন্ত বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে, কেননা তার কারণে জাতির সুনাম হানি হয়। এই নীতির অনুসরনে আমরা যখন নিজেদের জামাতের কিছু ব্যক্তির ভুলের জরিমানা বা এই ধরণের কোন শাস্তির বিধান করি, তখন কিছু নির্বোধ মানুষ সেটি পীরপুজো তকমা দিয়ে হৈ চৈ বাধায়। অথচ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে নিজের জামাতের

(শেষাংশ ১৫ পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

اِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে নিজের অবস্থান বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব যেহেতু মূল বিষয়ের দিকে আসতে চান না, তাই তিনি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সময় কাটাতে থাকেন। তিনি পরের লেখাতেও সেই একই গান গাইলেন- 'আপনি এতক্ষণ পরেও আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন না।' এর পরের লেখায় তিনি লিখলেন-'আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, আপনি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট বাক্যে দিলেন না।' এই লেখা পেয়ে 'আল হক' পত্রিকার (মোবাহাসার ধারাবিবরণী) প্রকাশক হযরত মৌলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী (রা.), কে বাধ্য হয়ে লিখতে হয়:-

"মৌলবী সাহেব! আপনি কি গোঁ ধরেই বসে থাকবেন? বিদ্বেষ ও বৈরিতার উত্তেজনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। দেখবেন, আপনাকে স্পষ্ট ও যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে।

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১)

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর ভনিতাপূর্বক দুঃখ প্রকাশ সম্পর্কে হযরত আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রা.) লিখলেন-

'আপনার আক্ষেপের শেষই হয় না আর হয়তো মৃত্যু (অর্থাৎ মোবাহাসার সমাপ্তি) পর্যন্ত এই আক্ষেপ থেকে মুক্তি মিলবে না। বেশ দেখাই যাক।"

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবস্থান রয়েছে যে কুরআন প্রধান এবং হাদীসের জন্য নিয়ামক। কুরআন মজীদ স্বয়ং নিজের এই মর্যাদা বর্ণনা করেছে। যখন কিনা আমরা দেখি যে হাদীসের মধ্যে বহু স্ববিরোধ আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন-

'ইবনে সিয়াদ-এর প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে যে হাদীসগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধ রয়েছে যা মসীহি দাজ্জাল সম্পর্কে রয়েছে,যার বর্ণনাকারী হলেন তামীম দারী। এখন আমরা এই দুই হাদীসের মধ্যে কোনটি সঠিক মনে করব? উভয় হাদীসই হযরত মুসলিম সাহেবের সহীহ হাদীসে বিদ্যমান।

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের মধ্যে স্ববিরোধের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন-

" সত্যিই যদি কোন হাদীস কুরআন করীমের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেই হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন, কুরআনের নয়। কেননা কুরআন করীমের শব্দগুলি একসূত্রে গাঁথা মুক্তোর ন্যায় স্ব স্ব স্থানে রাখা আছে। এছাড়া কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দ ও মাত্রা মানুষের হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত। এর বিপরীতে হাদীসগুলির শব্দ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত নয় এবং এর শব্দাবলীর স্মৃতি ও যথাস্থানে রাখার ক্ষেত্রে সেই নিয়মানুবর্তিতা নেই যা কুরআন করীমের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। এই কারণেই হাদীসসমূহে স্ববিরোধও বিদ্যমান। যা থেকে প্রমাণ হয় যে সব স্থানে স্ববিরোধ রয়েছে, সেখানে বর্ণনাকারীদের স্মৃতি লোপ পেয়েছে।"

হাদীসসমূহে স্ববিরোধের তত্ত্ব শুনে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব লেখেন-

'ইমামদের নেতা হুযাইমা থেকে বর্ণিত,

لَا اَعْرِفُ اَنَّهٗ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَانِ بِاِسْنَادَيْنِ صَحِيْحَيْنِ مُتَضَادَيْنِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ فَلْيَاْتِنِيْ بِهٖ لِاُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ ইমামদের ইমাম হুযাইমা থেকে বর্ণিত আমি এমন দুটি হাদীসকে সনাক্ত করি না যা নবী (সা.) থেকে সহীহ্ সনদসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে অথচ সেগুলি পরস্পর বিরোধী। যদি কারো কাছে এমন হাদীস থাকে তবে আমার কাছে নিয়ে আসুন। আমি সেগুলির মধ্যে সমন্বয় করব।

(আল হক লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৪)

এই ঘোষণার পর সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত কয়েকটি পরস্পর বিরোধী হাদীসে যদি তিনি সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করে দেখাতে পারেন, তবে ২৫ টাকা পুরস্কারের যোগ্য হবেন। তিনি বলেন-

"ইমাম খুযায়মা মৃত্যু বরণ করেছে, তাই এখন তাঁর দাবী নিয়ে আলোচনা করা অনর্থক। কিন্তু আমার মনে আছে, আপনি নিজের লেখা পড়ে শোনানোর সময় উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, ইবনে খুযাইমা যুগের ইমাম ছিলেন। আমি নিজেই দাবি করছি যে সহীহ্ সনদ স্বীকৃত দুটি স্ববিরোধযুক্ত হাদীসে আমি এখনই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করে দেখাতে পারি। আপনার এই দাবী সেই সময়ই নিরর্থক বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু মোনাযারার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী দৃষ্টিতে রেখে তখন আপনার বক্তব্যের মাঝখানে বলা সমীচীন ছিল না। কিন্তু আপনার আত্মপ্রশংসা সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকল, বিনয় ও বান্দেগীর কোন লক্ষণ দেখা গেল না আর সর্বক্ষণ নিজের পাণ্ডিত্যমনা আপনার আচরণে প্রকট হয়ে উঠল। কাজেই আমি আপনার এই দাবীর দৃষ্টিকোণ থেকেই আপনার জ্ঞানের উৎকর্ষ যাচাই করা সমীচীন মনে করলাম। যে যাচাইয়ের ফাঁকে আমার মূল বিতর্কও যেন সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমি স্বভাবতই কারো সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতে অপছন্দ করি। কিন্তু আপনি যেহেতু দাবি করে বসেছেন এবং অপরকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন, এমনকি আপনার মতে ইমামে আযমও (রহে.) হাদীসের পাণ্ডিত্যে আপনার তুলনায় আসেন না। এই জন্য আমি বুখারী ও মুসলিম থেকে এমন ছয় সাতটি বের করে আপনাকে দিতে চাই, আমার দৃষ্টিতে যেগুলির মধ্যে স্ববিরোধ আছে। আপনি যদি এগুলির মধ্যে ইমাম ইবনে হুযায়মার ন্যায় সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করে দেখাতে পারেন, তবে আমি জরিমানা হিসেবে নগদ পঁচিশ টাকা দিতে বাধ্য থাকব। অতঃপর আজীবন আপনার শ্রেষ্ঠত্বের অনুরাগী হয়ে থাকব এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিব। আর এই যে আমার কাছ থেকে জরিমানা হিসেবে পঁচিশ টাকা নেওয়া হবে, এর কারণে জনগণের হৃদয়পটে হাদীস বিদ্যায় আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে সসম্মানে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এর জন্য উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে তিনজন বিচারক নির্ধারণ করতে হবে যারা বক্তব্যের জ্ঞান ও যুক্তির গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম এবং যাদের সঙ্গে দুই পক্ষের কারো আত্মীয়তা, ধর্মীয় বা বন্ধুত্বের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকবে না। যদি পরে কোন সম্পর্ক প্রমাণিত হয় তবে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হবে অন্যথায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আপনি বিজয়ী হলে পঁচিশ টাকা আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে।.... এখন আপনি যদি আমার এই আবেদন এড়িয়ে যান, তবে নিঃসন্দেহে আপনার সমুদয় দাবী অসার আখ্যায়িত হবে এবং আপনি নিজের বিভিন্ন রচনায় আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আমার সম্পর্কে যে সব অবমাননাকর কথা লিখেছেন, সেগুলি সব আপনার উপর বর্তেছে বলে মনে করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিতাকারে আপনি এর উত্তর দিন।"

(আল হক মুবাহাসা লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০২)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা ইযালায়ে আওহাম পুস্তিকাতেও এই চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

" আপনি দাবি করেছিলেন, দুই সহীহ হাদীসের স্ববিরোধ দূর করতে পারেন। এর উত্তরে আপনাকে বলা হয়েছে যে, আপনি সম্মত হলে কয়েকজন বিচারক নির্ধারণ করে কয়েকটি পরস্পর বিরোধী হাদীস আপনার সামনে সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হবে। আপনি যদি নিজের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দিয়ে এই বিরোধ দূর করে দেখান, আপনি ২৫টাকা পুরস্কার পাবেন এবং আপনার পাণ্ডিত্য স্বীকৃতি লাভ করবে; নীরব থাকলে আপনার অজ্ঞানতা প্রমাণিত হবে। অথচ আপনি নীরবই থাকলেন।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

জুমআর খুতবা

কোন মানুষের দেখা সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি হলো হযরত রুকাইয়া এবং তার স্বামী হযরত উসমান (রা.)। তিনি বয়সে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে প্রায় পাঁচ বছর ছোট ছিলেন। তিনি প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হে আমার কন্যা! তুমি আবু আব্দুল্লাহ্‌র সাথে উত্তম আচরণ করবে, নিশ্চয় সে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রাখে।'

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

এগারো জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতি চারণ ও জানাযা গায়েব। প্রয়াত হয়েছেন মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব (সাবেক নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, মারকাযিয়া, নাযির খিদমতে দরবেশান এবং নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ রিশতানাতা), মাননীয় মহম্মদ উমর সাহেব (সাবেক নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান), মাননীয় হাবীব আহমদ ইবনে মহম্মদ ইসমাইল সাহেব (সাবেক আমীর ও মিশনারী ইনচার্য নাইজেরিয়া), মাননীয় বদরুজ্জামান সাহেব (যুক্তরাজ্যে ওকালত মাল বিভাগের কর্মী), মাননীয় মনসুর আহমদ তাসির সাহেব (নাযারত আমুরে আমা, রাবোয়া-র কর্মী), মাননীয় ডক্টর ইব্রাহিম মোয়াঙ্গা সাহেব (তানজেনিয়া), মাননীয়া সুগরা বেগম সাহেবা (কাদিয়ানের দরবেশ দ্বীন মহম্মদ নঙ্গালী সাহেবের স্ত্রী), মাননীয় চৌধুরী কারামাতুল্লাহ সাহেব (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর সাবেক স্বেচ্ছাসেবী), মাননীয় চৌধুরী মানোয়ার আহমদ খালিদ সাহেব (জার্মানী), মাননীয়া নাসীরা বেগম সাহেবা (বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত মুবব্বী আহমদ সাদিক তাহির মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী) এবং মাননীয় রফীউদ্দীন সাহেব (বদমলহবী)।

আলজেরিয়া এবং পাকিস্তানে আহমদীদের প্রবল বিরোধীতার কথা দৃষ্টিপটে রেখে বিশেষ দোয়ার প্রতি আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২২ শে জানুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা ২২ সুলাহা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) বলেন:আজ হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ শুরু করব এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে প্রথম যে বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক তা হল, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। এতদসত্বেও তিনি সেই আটজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধেলব্ধ সম্পদ বা মালেগণিমত থেকে অংশ প্রদান করে পক্ষান্তরে তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

তাঁর নাম হযরত উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসায় বিন কিলাব। এভাবে তাঁর বংশধারা ৫ম পুরুষ আবদে মানাফে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর বংশধারায় মিলে যায়। হযরত উসমানের (রা.) মায়ের নাম ছিল আরওয়া বিনতে কুরায়েয। তাঁর নানী হলেন উম্মে হাকীম বায়জা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব- যিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্'র সহোদরা। এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত উসমান (রা.)-এর নানী উম্মে হাকীম বায়জা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব যমজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমানের (রা.) মাতা আরওয়া বিনতে কুরায়েয হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন আর নিজ পুত্র হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে আমৃত্যু মদীনাতেই জীবনযাপন করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর পিতা জাহিলিয়্যাতের যুগেই মারা যান।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইমাম হাজার আসকালানী, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৩৭৭) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, রচনা- আলী মহম্মদ আসসালাবী, পৃ: ১৫) (সীরাতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮২.১৮৩)

হযরত উসমান (রা.)-এর ডাকনাম নামের বিষয়ে বলা হয় অজ্ঞতার যুগে তার ডাকনাম ছিল আবু আমর। যখন রসুল (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়ার গর্ভে তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহ্‌র জন্ম হয় তখন মুসলমানদের মাঝে তাঁর উপনাম 'আবু আব্দুল্লাহ' প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, রচনা- আলী মহম্মদ আসসালাবী, পৃ: ১৫)

ইবনে ইসহাকের মতানুসারে মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়্যাকে বিয়ে দেন- যিনি উহুদের যুদ্ধের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তখন মহানবী (সা.) নিজ অপর কন্যা হযরত রুকাইয়্যার সহোদরা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে বিয়ে দেন। এ কারণেই তাঁকে জুন্নুরাইন বলে সম্বোধন করা হয়।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা লি ইমাম হাজার আসকালানী, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৩৭৭)

এটিও বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে জুন্নুরাইন এ কারণে বলা হতো যে, তিনি প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে পবিত্র কুরআনের এক বৃহদাংশ তিলাওয়াত করতেন। যেহেতু কুরআন হলো নূর এবং রাতে দণ্ডায়মান হওয়া তথা তাহাজ্জুদও এক প্রকার নূর বিশেষ, তাই তিনি জুন্নুরাইন তথা দুই নূরের সমাহার বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, রচনা- আলী মহম্মদ আসসালাবী, পৃ: ১৬)

এমনি একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে। এক সঠিক বর্ণনানুসারে মক্কায় হযরত উসমান (রা.) এর জন্ম হয়েছে 'আমুল ফীল' অর্থাৎ মক্কার উপকণ্ঠে আবরাহা বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ছয় বছর পর। আর এটিও বলা হয়েছে যে, তিনি তায়েফে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়সে মহানবী (সা.)-এর চেয়ে প্রায় পাঁচ বছর ছোট ছিলেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, রচনা- আলী মহম্মদ আসসালাবী, পৃ: ১৬)

তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে ইয়াযিদ বিন রোমান বর্ণনা করেন, একবার হযরত উসমান বিন আফফান এবং হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, দু'জনেই হযরত যুবায়ের বিনুল আওয়ামের পিছু নেন এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) তাদের উভয়ের কাছে ইসলামের বাণী

উপস্থাপন করলেন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনালেন। তাদেরকে ইসলামের মানুষের দায়িত্ব এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে এমন সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তাঁরা উভয়ে তথা হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) ঈমান আনেন এবং তাঁর সত্যায়ন করেন। হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সম্প্রতি সিরিয়া থেকে ফেরত এসেছি। যখন আমরা মাআন এবং যারকা নামক স্থানে অবস্থান করেছিলাম, [মাআন হল জর্ডানের দক্ষিণে হিজাজের সীমান্তবর্তী একটি শহর আর যারকা মাআনের পাশেই অবস্থিত একটি জায়গা যাহোক তিনি বলেন,] সেখানে আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম, তখন এক ঘোষক এই ঘোষণা দিল যে, হে ঘুমন্তরা জাগ্রত হও, নিশ্চয় মক্কায় আহমদ আবির্ভূত হয়েছেন। ফিরে আসার পর আমরা আপনার (দাবীর) কথা শুনলাম। হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর দারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য়খণ্ড, পৃ: ৩১) (মুজামুল বালদান, পৃ: ৩২০, মুজামুল বালদান,৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭২)

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়। মুসা বিন মোহাম্মদ তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফফান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর চাচা হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়া তাঁকে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং বলে তুমি পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে কি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ? খোদার কসম এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়বনা। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন খোদার কসম, আমি এটি কখনও ছাড়বনা আর এটি থেকে কখনও পৃথকও হব না। হাকাম ইসলামের উপর তাঁর দৃঢ়তা দেখে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১)

হযরত রুকাইয়ার সাথে তাঁর বিয়ের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর নবুয়তের দাবীর পূর্বে হযরত রুকাইয়ার সম্পর্ক আবু লাহাবের পুত্র উতবা এবং তাঁর বোন উম্মে কুলসুমের সম্পর্ক উতবার ভাই উতাইবার সাথে নির্ধারিত হয়েছিল। যখন 'সুরাতুল মাসাদ' অর্থাৎ 'সুরাতুল লাহাব' অবতীর্ণ হয় তখন তাদের পিতা আবু লাহাব তাদেরকে বলে যে, তোমরা উভয়ে যদি মোহাম্মদ (সা.) এর কন্যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর তাহলে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের সাথে এই সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেল। তখন তারা উভয়েই রুখসাতানার পূর্বেই উভয় বোনকে তালাক দিয়ে দেয়। এরপর হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) মক্কাতেই হযরত রুকাইয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাকে সাথে নিয়ে হাবশার দিকে হিজরত করেন। হযরত রুকাইয়া এবং হযরত উসমান (রা.) উভয়ই সৌন্দর্যে ছিলেন অনন্য। যেমন কথিত আছে যে, 'আহ্‌সানা যাওজাইনে রাআহুমা ইনসানুন রুকাইয়্যাতু ও যাওজুহা উসমানা' অর্থাৎ কোন মানুষের দেখা সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি হলো হযরত রুকাইয়া এবং তার স্বামী হযরত উসমান (রা.)।

(শারাহ আল্লামা যারকানি, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৩২২-৩২৩)

আব্দুর রহমান বিন উসমান কুরাশী থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) একদা তাঁর মেয়ের বাড়ীতে গেলেন। তিনি তখন হযরত উসমান (রা.)-র মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, এই দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন, 'হে আমার কন্যা! তুমি আবু আব্দুল্লাহ্‌র সাথে উত্তম আচরণ করবে, নিশ্চয় সে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রাখে।'

(আল মুজামুল কবীর লিতিবরানী, ১ম ভাগ, পৃ: ৭৬, হাদীস-৯৮)

ইবনে ইসহাক হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) দেখলেন যে, তাঁর সাহাবীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন আর আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে তার সম্পর্ক ও পদমর্যাদার কারণে এবং নিজ চাচা আবু তালেবের সুবাদে তিনি (সা.) নিরাপদ ছিলেন; এর বিপরীতে সাহাবীরা যে পরীক্ষায় নিপতিত ছিলেন তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তিনি (সা.) কোন শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন না অর্থাৎ তিনি (সা.) তো কিছুটা নিরাপদে ছিলেন কিন্তু তাঁর সাহাবাদের প্রতি যে নির্যাতন হচ্ছিল তা প্রতিহত করার কোন শক্তি-সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের বললেন, 'তোমরা হাবশা চলে যাও, সেখানে এমন একজন বাদশাহকে পাবে যার রাজত্বে কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করা হয় না, আর সেই রাজত্ব হচ্ছে সত্যের আবাসস্থল। (তোমরা সেখানে অবস্থান কর) যতদিন না আল্লাহ্‌ তা'লা তোমাদেরকে বর্তমান পরীক্ষা থেকে মুক্তি দেন।' তখন মহানবী (স.)-এর সাহাবীগণ অশান্তির ভয়ে এবং স্বীয় ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য মহানবী (স.)কে ছেড়ে আবিসিনিয়ার দিকে যাত্রা করেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত ছিল।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবীদের মধ্যে নিজের স্ত্রী রসূলকণ্যা হযরত রুকাইয়াসহ হযরত ওসমানও ছিলেন।

(আসসীরাতুন্নাবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৩৭-২৩৮)

হযরত আনাস বর্ননা করেছেন, হযরত ওসমান আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করার জন্য বের হলে তাঁর সাথে হযরত রুকাইয়া বিনতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)ও ছিলেন। নবী করীম (সা.) পর্যন্ত তাঁর সংবাদ পৌঁছুতে দেরী হল। এটি জানা সম্ভব হয় নি যে, তারা হিজরত করে কোথায় পৌঁছেছেন, এবং কী অবস্থায় আছেন? তিনি বাইরে এসে তাদের সংবাদের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। এরপর এক মহিলা এসে তাঁদের সম্পর্কে তাঁকে (সা.) অবগত করে। সব শুনে তিনি (সা.) বলেন, হযরত লূত (আ.) এর পর ওসমান সেই প্রথম ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করেছে।

(মাজমুয়ায়েয যোয়ায়েদ, ওয়া মামবাউল ফোয়ায়েদ, ৯ম ভাগ, পৃ: ৫৮)

হযরত সা'দ বর্ননা করেছেন, হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান যখন আবিসিনিয়ার দিকে হিজরতের সংকল্প বাঁধেন তখন মহানবী (স.) তাকে বলেন, রুকাইয়াকেও সাথে নিয়ে যাও। আমার ধারণা তোমাদের একজন আরেকজনের মনোবল যোগাবে। অর্থাৎ দু'জন একসাথে থাকলে একে অন্যের মনোবল বৃদ্ধি করবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (স.) হযরত আবু বকরের কন্যা আসমাকে বলেন, যাও তাদের উভয়ের সংবাদ নিয়ে এসো। অর্থাৎ তারা বেরিয়ে গেছে, কোথায় পৌঁছেছে, বাইরের অবস্থা কীরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত আসমা যখন ফেরত আসলেন তখন রসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর কাছে হযরত আবু বকরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বল্লেন, হযরত ওসমান একটি খচ্চরে 'পালান' বেঁধে তাতে হযরত রুকাইয়াকে বসিয়ে সমুদ্র অভিমুখেক যাত্রা করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেন, হে আবু বকর! হযরত লূত ও হযরত ইবরাহীমের পর এ দু'জন হিজরতকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরতকারী।

(মুসতাদরাক, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৪১৪, কিতাব মারেফাতিস সাহাবা, বাব যিকরু রুকাইয়া বিনতে রসুলুল্লাহ্‌, হাদীস-৬৯৯৯)

আবিসিনিয়া থেকে তার ফেরত আসার ঘটনাও বর্নিত হয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর যে সাহাবীগণ আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেন তারা সংবাদ পান যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এতে এ মুহাজেরগণ আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরত আসেন। তারা যখন মক্কার নিকটে পৌঁছান তখন তারা জানতে পারেন যে, উক্ত সংবাদ ভুল ছিল। তখন তারা গোপনভাবে বা কারো নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন এরূপ ছিলেন যারা মদীনা হিজরত করেন এবং বদর ও ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (স.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। আর তাদের মধ্যে কয়েকজনকে কাফেরগণ মক্কায় থাকতে বাধ্য করেন এবং তারা বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে মক্কা থেকে পুনরায় মদীনায় হিজরতকারীদের মধ্যে হযরত ওসমান এবং তার স্ত্রী হযরত রুকাইয়া বিনতে রসূলুল্লাহ্‌ (স.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আসসীরাতুন নবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৬৫-২৬৬)

হযরত ওসমান আবিসিনিয়াতে কয়েক বছর থাকেন। এক পুস্তকে এরূপ লেখা আছে যে সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। এরপর যখন কতিপয় সাহাবী কুরায়েশদের ইসলাম গ্রহণের ভুল সংবাদ শুনে নিজ দেশে ফেরৎ আসেন তখন হযরত ওসমান (রা.)-ও (ফিরে আসেন।) এখানে ফিরে এসে জানা গেল এ সংবাদ মিথ্যা। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় সাহাবী পুণঃরায় আবিসিনিয়া ফিরে যান। হযরত ওসমান (রা.) মক্কাতেই অবস্থান করেন। এক সময় মদীনার দিকে হিজরত করার সুযোগ সষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সকল সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করতে বলেন। তখন হযরত ওসমান (রা.) নিজ পরিবারবর্গের সাথে মদীনা গমন করেন।

(সিয়ারুস সাহাবা ১ম খণ্ড, (খোলাফায়ে রাশেদীন) পৃ: ১৭৮

একটি রেওয়ায়েতে এ-ও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত উসমান দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮২.১৮৩)

কিন্তু অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থে হযরত উসমানের আবিসিনিয়ায় এই দ্বিতীয় হিজরতের উল্লেখ নেই। এমনিতেও আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের যে পটভূমি ও বিবরণ সীরাত ও হাদীস-গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে, তা সতর্ক ইতিহাসবীদরা হুবহু সেভাবে গ্রহণ করেন না, কারণ ঘটনার ধারাবাহিকতায় এমনটি ঘটা অসম্ভব ছিল। যেমন আবিসিনিয়ার হিজরত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সাহেব নিজের

গবেষণা কর্ম তুলে ধরেছেন, যদিও আমি এই ঘটনার কিছু অংশ পূর্বে অন্যান্য সাহাবীদের জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছি, কিন্তু এস্থানেও এর উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গবেষণা হলো :মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হল এবং কুরায়শরা তাদের অত্যাচারে ক্রমাগত বেড়েই চলল, তখন রসূলে করীম (সা.) মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন, তারা যেন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তিনি (সা.) আরও বলেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ একজন ন্যায়বিচারক। তার সাম্রাজ্যে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। আবিসিনিয়া দেশটিকে ইংরেজিতে ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া বলা হয়। এটি আফ্রিকার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং ভৌগলিক দিক থেকে এটি দক্ষিণ আরবের একেবারে বিপরীতে অবস্থিত। এই দুটির মাঝে লোহিত সাগর ছাড়া আর কোন দেশ নেই। সেই যুগে আবিসিনিয়ায় একটি শক্তিশালী খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখানকার শাসকের উপাধি ছিল নাজ্জাসি। আজও অর্থাৎ যখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন তখনও সেখানকার শাসক এই উপাধিতেই সম্বোধিত হন। আবেসিনিয়ার সাথে আরবের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং সেই যুগে আবিসিনিয়ার রাজধানী ছিল আকসুম যেটি বর্তমানের আদোয়ার কাছে অবস্থিত। এটি এখন পর্যন্ত একটি পবিত্র নগরী হিসেবে সমাদৃত। আকসুম সেই যুগে একটি শক্তিশালী সাম্রজ্যের রাজধানী ছিল এবং তখনকার বাদশা নাজ্জাসির ব্যক্তিগত নাম ছিল আসহামা, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ এবং শক্তিশালী বাদশা ছিলেন। মোটকথা মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব, তারা যেন আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। অতএব মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে নবুয়্যতের ৫ম বছর রজব মাসে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করে। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম হল, হযরত উসমান বিন আফফান এবং তাঁর সহধর্মিনী রসুলে করীম (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা, উসমান বিন মাযউন, মুসআব বিন উমায়ের, আবু সালেমা বিন আব্দুল আসাদ এবং তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালেমা। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এখানে লিখেন, এটি এক অদ্ভুত বিষয়, প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের অধিকাংশই কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখত আর দুর্বল লোক খুব কমই দেখা যায়। এটি থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়; প্রথমত, শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত মুসলমানরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে সুরক্ষিত ছিল না। দ্বিতীয়ত, দুর্বল প্রকৃতির লোক যেমন দাস প্রভৃতি সেই সময় এমন নিরুপায় এবং অসহায় ছিল যে, হিজরত করার সামর্থ্য রাখত না।

এসকল মুহাজির যখন দক্ষিণ দিকে সফর করে শুয়ায়েবা পৌঁছে যা সেযুগে আরবের একটি সমুদ্রবন্দর ছিল তখন আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হল যে, তারা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যায় যেটি ইথিওপিয়ার দিকে যাত্রা করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। সুতরাং তারা সবাই নিরাপদে সেই জাহাজে আরোহণ করে এবং জাহাজ রওনা হয়ে যায়। মক্কার কুরাইশ তাদের হিজরতের খবর পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল, তারা ভাবল, শিকার এত সহজে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল! অতঃপর তারা সেসব মুহাজিরদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু তাদের লোকজন যখন সমুদ্রতীরে পৌছে ততক্ষণে জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। তাই তারা ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ ফিরে আসে। ইথিওপিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা খুবই নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে এবং আল্লাহ্ আল্লাহ করে কুরাইশদের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু যেমনটি অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, মুহাজিরদের ইথিওপিয়ায় যাওয়ার ঘটনা তখনো বেশি দিন হয়নি, তাদের কাছে একটি উড়ো সংবাদ পৌঁছে যে, কুরাইশ মুসলমান হয়ে গেছে আর মক্কায় এখন একেবারে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। এই সংবাদের ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, অধিকাংশ মুহাজের চিন্তাভাবনা না করেই ফিরে আসে। এরা যখন মক্কার কাছাকাছি এসে পৌছে তখন জানতে পারে, সংবাদটি ছিল ভিত্তিহীন। এই পরিস্থিতিটি তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। অবশেষে অনেকে রাস্তা থেকেই ফিরে যায় আর অনেকে চুপিসারে বা কোন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিরাপত্তায় মক্কায় চলে আসে। এটি ৫ নববীর শাওয়াল মাসের ঘটনা অর্থাৎ হিজরতের সূচনা ও মুহাজেরদের ফিরে আসার মাঝে কেবল আড়াই-তিন মাসের ব্যবধান আছে।.....

যদিও সত্যিকার অর্থে এই গুজব একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ছিল, যে গুজব নিশ্চয় কুরায়েশরা ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনতে এবং তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করার উদ্দেশ্যে ছড়িয়েছিল। বরং গভীর অভিনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, এই গুজব এবং মুহাজেরদের ফিরে আসার কাহিনীই ভিত্তিহীন । তবে, যদি এটিকে সঠিক ধরে নেওয়া হয় তাহলে হতে পারে এর নেপথ্যে সেই ঘটনা রয়েছে যার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়েত যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উসমান সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন- এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে সেটি ভুল প্রমাণিত হয়। আর যদি এটিকে ভুল মনে করা হয় তাহলে নিশ্চয় তিন বা চার মাসেই তারা ফিরে এসেছিলেন। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের গবেষণা হলো, এটি ভ্রান্তই ছিল। তিনি লিখেন, এটিকে যদি সঠিক মনে করা হয় তাহলে হতে পারে এর নেপথ্যে সেই ঘটনা রয়েছে যা কতিপয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি বুখারী শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) কাবার আঙ্গিনায় সূরা নজমের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন। সে সময় সেখানে কাফেরদের বেশ কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিল আর কতিপয় মুসলমানও ছিলেন। তিনি (সা.) সূরা নজমের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত শেষে সিজদা করেন আর তাঁর সাথে উপস্থিত মুসলমান ও কাফের সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। যাহোক, কাফেররা কেন সিজদা করেছিল- এর কারণ হাদীসে উল্লেখ নেই। কিন্তু মনে হয়, মহানবী (সা.) যখন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেন আর এসব আয়াতে বিশেষভাবে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ক্ষমতা ও প্রতাপের অতীব উচ্চাঙ্গীন ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল এবং তাঁর অনুগ্রহরাজি স্মরণ করানো হয়েছিল আর এক প্রতাপান্বিত ও মহিমান্বিত ভাষায় কুরায়েশকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তারা যদি নিজেদের দুষ্কৃতি হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের পরিণতিও তাদের পূর্ববর্তী সেসব জাতির ন্যায় হবে যারা খোদার রসূলদের মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর সবশেষে এসব আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, আস, আল্লাহর সমীপে সিজদায় পতিত হও। এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর মহানবী (সা.) এবং উপস্থিত সকল মুসলমান একযোগে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।এই বাণী ও এই দৃশ্যের এমন সম্মোহনী প্রভাব কুরায়েশদের ওপর পড়ে যে, তারাও অবলীলায় মুসলমানদের সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, এমন উপলক্ষ্যে এমন পরিস্থিতির অধীনে প্রায় সময় মানুষের হৃদয় ত্রস্ত হয়ে যায় আর অবলীলায় সে এমন কাজ করে বসে যা তার নীতি ও ধর্ম পরিপন্থী হয়ে থাকে।"..... মানার কারণেই এমনটি হবে- তা আবশ্যক নয়। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্বেও কিছু কাজ হয়ে যায়। "কোন কোন সময় এক আকস্মিক বিপদের সময় এক নাস্তিকও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বা রাম রাম বলে ওঠে। আমিও কতিপয় নাস্তিককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলে- একথা একেবারে সঠিক। খোদার প্রতি আমাদের বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ভয়াবহ পরিস্থিতির দেখা দেয় তখন অবলীলায় মুখ থেকে 'খোদা' শব্দ বেরিয়ে পড়ে। যাহোক, কুরায়েশরা তো নাস্তিক ছিল না বরং তারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। অতএব, এই প্রতাপী ও বলিষ্ঠ বাণী পাঠের পর মুসলমানরা যখন একসাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন এর এমন জাদুময় প্রভাব পড়ে যে, তাদের সাথে কুরায়েশরাও অবলীলায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এমন প্রভাব সাধারণত সাময়িক হয়ে থাকে এবং মানুষ স্বল্পক্ষণের মাঝেই নিজ আসল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। এখানেও তেমনটিই হয়েছে আর সিজদা থেকে ওঠে কুরায়েশ যেমন মূর্তিপূজারী ছিল ঠিক তেমনই মূর্তিপূজারীই রয়ে যায়।" এমন নয় যে, তারা একত্ববাদী হয়ে গিয়েছিল।

" যাহোক, এটি একটি ঘটনা যা বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। অতএব ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের ফিরে আসার ঘটনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে মনে হচ্ছে যে, এ ঘটনার পর কুরায়েশ যারা ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের ফিরিয়ে আনার জন্য অস্থির ছিল; তারা এ কাজকে পুঁজি করে নিজেরাই হয়তো এই গুজব রটিয়ে দিয়ে ছিল যে, মক্কার কুরায়েশরা মুসলমান হয়ে গেছে। আর এখন মুসলমাদের জন্য মক্কাতে পুরোপুরি শান্তি বিরাজমান। এ গুজব যখন ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের নিকট পৌঁছে; তারা এটা শুনে স্বভাবতই খুবই আনন্দিত হন এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা ফিরে আসেন। কিন্তু তারা যখন মক্কার অদূরে পৌঁছেন তখন প্রকৃত ঘটনা জানতে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ কর, যা অবিচলতা অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ও অভ্যাসগতভাবে নয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুগ্রহ ও সৌন্দর্যকে দৃষ্টিতে রেখে এবং তাঁর পদমর্যাদার উন্নতি ও সফলতার জন্য।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)

পারেন; আর কতক গোপনে আর কতক কুরায়েশের কোন প্রভাবশালী বা ক্ষমতাধর নেতার নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন আর কতক ফিরে চলে যান। সুতরাং যদি কুরায়েশদের মুসলমান হয়ে যাওয়ার গুজবের কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে তা কেবল ততটা যতটা সূরা নজম তিলাওয়াতের পর সিজদার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যাহোক, ইথিওপিয়ার মুহাজেররা যদি ফিরে এসেও থাকে তাহলে তাদের অধিকাংশই ফিরে যায়; আর কুরায়েশ যেহেতু প্রতিনিয়ত নিজেদের নির্যাতন-নিপীড়ন বৃদ্ধি করছিল আর তাদের অত্যাচার-নিপিড়ন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে অন্য মুসলমানরাও গোপনে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন এবং সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন। এই হিজরতের ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, অবশেষে ইথিওপিয়ায় মুহাজেরদের সংখ্যা একশ' এক পর্যন্ত পৌঁছে যায়; এদের মাঝে আঠারোজন মহিলাও ছিলেন। আর মক্কায় মহানবী (সা.) এর কাছে খুব অল্প মুসলমানই রয়ে গিয়েছিল। এ হিজরতকে কতিপয় ঐতিহাসিক ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত বলে অভিহিত করে থাকেন।....."

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) নিজের একটি বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আরেকটি বিষয় রয়েছে যা এই গুজব এবং মুহাজেরদের ফেরত আসার পুরো ঘটনাকেই সন্দেহযুক্ত করে তুলে আর তা হলো; ইতিহাসে ইথিওপিয়ার হিজরতের তারিখ লিখা আছে রজব পঞ্চম হিজরী আর সিজদার ঘটনা পঞ্চম নববীর রমযানে ঘটেছে বলে লিখা আছে। অধিকন্তু ইতিহাসে একথাও লিখা আছে যে, সেই গুজবের ফলে ইথিওপিয়ার মুহাজেরদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ঘটে পঞ্চম নববীর শওয়াল মাসে। বলতে গেলে, হিজরতের সূচনা এবং মুহাজেরদের ফিরে আসার মাঝে কেবল দুই বা তিন মাসের ব্যবধান ছিল। আর সিজদার তারিখ থেকে যদি কাল গণনা করা হয় তাহলে এই সময়কাল কেবল একমাস হয়। সেই যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা ও ইথিওপিয়ার মাঝে তিনটি সফর সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানদের ইথিওপিয়া যাওয়া তারপর কোন ব্যক্তি কুরাইশদের মুসলমান হওয়ার সংবাদ নিয়ে মক্কা থেকে ইথিওপিয়া পৌঁছে দেওয়া আর এরপর মুসলমানদের ইথিওপিয়া থেকে যাত্রা করে মক্কায় ফিরে আসা- এই তিনটি সফর, প্রস্তুতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বাদ দিলেও এই অল্প সময়ের ভেতর সম্পূর্ণ অসম্ভব। সিজদার যুগ থেকে আরম্ভ করে মুহাজেরদের ইথিওপিয়া গিয়ে তথাকথিত প্রত্যবর্তন বা দুটি সফর সম্পন্ন করা আরো বেশি অসম্ভব ছিল। কেননা সেই যুগে মক্কা থেকে ইথিওপিয়া যাওয়ার জন্য প্রথমে দক্ষিণ দিকে যেতে হতো, তারপর নৌকাযোগে যা সবসময় পাওয়া যেত না, লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত যেতে হতো। এরপর উপকূল থেকে ইথিওপিয়ার রাজধানী উকসুম পর্যন্ত পৌঁছাতে হতো যা উপকূল থেকে অনেক দুরত্বে অবস্থিত। সেই যুগের ধীর গতি সম্পন্ন সফরের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরণের একটি সফরও দেড় দুই মাসের পূর্বে সম্পন্ন করা মোটেও সম্ভব ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাহিনী সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। পায়। এতে যদি কোন সত্য থেকেও থাকে তাহলে তা কেবল সেটিই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লামু। আল্লাহই ভালো জানেন।"

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ১৪৬-১৫২)

মোটকথা এর কারণ যা-ই থাকুক, কিছুদিন পর হযরত ওসমান (রা.) ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর মদীনায় হিজরত এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, হযরত মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বনূ নাজ্জার গোত্রের হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা.)-এর ভাই হযরত অওস বিন সাবিত (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

মূসা বিন মুহাম্মদ নিজ পিতার বরাতে বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, হযরত শাদ্দাদ বিন অওস (রা.)-এর পিতা হযরত অওস বিন সাবিত এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করা হয়েছিল। আর এটিও বলা হয় যে, হযরত আবু উবাদাহ্ সা'দ বিন উসমান যুরাকী (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১)

আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তাবাকাতে কুবরা-তে লেখা আছে, ইবনে লাবিবা বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে যখন অবরুদ্ধ করা হয় অর্থাৎ শেষের দিনগুলোতে যখন শত্রুরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে এবং সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তার ওপর আরোপ করে, তখন তিনি (রা.) একটি উঁচু কুঠুরীর জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মাঝে কি তালহা আছে? তারা বলে, হ্যাঁ, আছে। অতঃপর তিনি হযরত তালহা (রা.)কে বলেন, খোদার দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, রসূলে করীম (সা.) যখন মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি (সা.) কি নিজের সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন নি? অর্থাৎ, মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়েছিলেন। উত্তরে হযরত তালহা (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! এটি সঠিক। তার চারপাশে বিরোধীরাই ছিল, যারা হযরত উসমান (রা.) এর ঘর অবরোধ করে রেখেছিল। উত্তর শুনে, তারা হযরত তালহা (রা.)-এর ওপর চড়াও হয়ে বলে, তুমি এটি কী করলে? তাদের প্রশ্নের জবাবে তখন হযরত তালহা (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেন, হযরত উসমান (রা.) আমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন এবং যে বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন তা আমার চোখের সামনে ঘটেছে। তারপরও কি আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবো না?

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

আমি তো মিথ্যা বলতে পারি না। তোমাদের যা বিরোধিতা করার কর।

হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর মৃত্যুবরণ এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর সাথে বিয়ের ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুকনেফ বিন হারেসা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর পাশে রেখে যান, কেননা তিনি ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) বদরের যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ নিয়ে যেদিন মদীনায় এসেছিলেন; যে বিজয় আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে দান করেছিলেন ঠিক সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) গনীমতের মালে হযরত উসমান (রা.)-এর জন্য বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান অংশ নির্ধারণ করেন। হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর মৃতুবরণের পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর সাথে নিজ কন্যা সাহেবযাদী হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিয়ে দেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খন্ড, পৃ: ৩২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মসজিদের দরজার সম্মুখে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর সাক্ষাত হয় এবং তিনি (সা.) বলেন, উসমান! ইনি জিবরাঈল। তিনি আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, রুকাইয়্যার সাথে তোমার উত্তম আচরণের কারণে আল্লাহ্ তা'লা উম্মে কুলসুমের বিয়ে রুকাইয়্যার সমপরিমাণ দেন মোহরানায় করিয়ে দিয়েছেন।

(সুনানে ইবনে মাজা, ইফতিতাহুল কিতাব, হাদীস-১১০)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দ্বিতীয় কন্যার বিয়েও যেন হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে দেওয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিয়ে দিলেন তখন তিনি হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-কে বলেন, আমার কন্যা উম্মে কুলসুমকে প্রস্তুত করে উসমানের ঘরে রেখে আসো এবং তার সামনে ঢোল বাজাও। তিনি এমনটিই করেছেন। মহানবী (সা.) ৩ দিন পর উম্মে কুলসুমের ঘরে যান এবং বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! নিজের স্বামী সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য কী? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি সর্বোত্তম স্বামী।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, রচনা- আলী মহম্মদ আসসালাবী, পৃ:৪১)

হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর ঘরে ৯ম হিজরী পর্যন্ত ছিলেন। এরপর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান আর তার কবরের পাশে বসেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কে তিনি হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) এর কবরের পাশে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে থাকতে দেখেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উসমান বিন আফফান, রচনা- আলী মহম্মদ

যুগ খলীফার বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে বিষয়ে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

(ডেনমার্কের জলসা সালানা (২০১৯) উপলক্ষ্যে বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

আসসালাবী, পৃ: ৪২)

বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে এ ঘটনাটির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে হেলাল বর্ণনা করেন, তিনি [অর্থাৎ আনাস (রা.)] বলতেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর কন্যার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, রসলুল্লাহ্ (সা.) কবরের পাশে বসে ছিলেন আর তখন আমি দেখি তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩৪২)

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) -এর মৃত্যুতে বলেন, আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকলে আমি তাকেও উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কোন এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন, হযরত উসমান (রা.) সেখানে বসে আছেন আর তিনি মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত উম্মেকুলসুম (রা.)-এর মৃত্যুশোকে কাঁদছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) এর সাথে তাঁর দুইজন সঙ্গী, অর্থাৎ হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) ও ছিলেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উসমান! তুমি কাঁদছো কেন? তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি কাঁদছি কেননা আপনার সাথে আমার জামাতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। (আপনার) দুই কন্যাই মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি (সা.) বলেন, কেঁদো না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আমার ১০০জন মেয়েও থাকত আর তাদের প্রত্যেকেই এক এক করে মৃত্যুবরণ করত তাহলে আমি একজনের পর অপর জনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতাম,এমনকি ১০০ জনের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকত না।

(কুনযুল উম্মাল, ভাগ-১৩, পৃ: ২১)

যাহোক এটি ছিল (তাদের) পারস্পরিক ভালোবাসা যার বহিঃপ্রকাশ উভয় পক্ষ থেকে হয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর এক উৎকণ্ঠা ছিল। এই আত্মীয়তার সম্পর্ক মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং এই নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, এই সম্পর্ক তো এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে। অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ ভবিষ্যতে হবে ইনশাআল্লাহ্।

যেভাবে আমি প্রত্যেক জুমআতেই আহ্বান জানাচ্ছি, অর্থাৎ দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, পাকিস্তানের মানুষদের জন্য বিশেষ করে আহমদীদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। বিরুদ্ধবাদীরা তো নিজেদের ধ্যান ধারণানুসারে গন্ডি সংকীর্ণ করছে কিন্তু তারা জানে না যে, সবার ওপর এক মহান সত্ত্বাও রয়েছেন অর্থাৎ খোদাও রয়েছেন যাঁর নিয়তি চলমান আছে,তাঁর বেষ্টনীও তাদের জন্য সংকীর্ণ হচ্ছে আর তা যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে তখন তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এসব লোককে বিবেকবুদ্ধি দান করুন আর তারা যেন এখনো বিবেকবুদ্ধি খাটায়, ন্যায়বিচার করে এবং বিনা কারণে নিপীড়ন, নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার মানুষদের জন্যও দোয়া করুন যাতে তাদের ঈমান নিরাপদ থাকে। একইভাবে আরো কোন কোন স্থানেও আহমদীদের চরম বিরোধীতা হচ্ছে। আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক আহমদীকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত রাখুন।

নামাযের পর কয়েক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, তাদের স্মৃতিচারণও এখানে করে দিচ্ছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মোকার্‌রম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের। তিনি সাবেক নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া, নাযের খেদমতে দরবেশান এবং নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এবং নাযের রিশতানাতাও ছিলেন। তিনি গত ১১ জানুয়ারি রাবওয়ায় প্রায় ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । তার পিতার নাম চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন এবং মাতার নাম ছিল রহমত বিবি। তার পিতা ১৯২৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়াতের ভুবনে পদার্পণ করেন। হযরত মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব তার একমাত্র পুত্র ছিলেন। মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব মিডল (অর্থাৎ মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে জীবন উৎসর্গ করে কাদিয়ানের মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। পাকিস্তান গঠনের পর আহমদনগরে অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়ায় চলে যান, যেখান থেকে ১৯৫২ সালে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা দেন এবং ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানেই চৌধুরী সা'দ উদ্দীন সাহেবের কন্যা মাহমুদা শওকত সাহেবার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৬০ সালের সালানা জলসায় মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেব তার বিয়ে পড়ান। তার সন্তানদের মধ্যে চার পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছেন। তার এক পুত্র হাসান মাহমুদ ওয়াকেফে যিন্দেগী (জীবনোৎসর্গকারী), তিনি রাবওয়ায় তাহরিকে জাদীদ দপ্তরে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছেন। জনাব মওলানা সাহেবের প্রথম পদায়ন গুজরাতে হয়েছিল, একইভাবে তিনি মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত তিনি ঘানাতে ছিলেন। এটি সেই যুগের কথা যখন আমিও সেখানে ছিলাম। আমি দেখেছি, তিনি সেখানে অত্যন্ত নিঃস্বার্থহীনভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত তিনি মজলিসে কারপরদাযের সেক্রেটারীও ছিলেন, এরপর ৮৩ সালে মজলিসে কারপরদাযের সদর মনোনীত হন। ১৯৮৩ থেকে ৯৮ পর্যন্ত তিনি নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মার্কাযিয়ার দায়িত্ব পালন করেন, ২০১১ পর্যন্ত নাযের খেদমতে দরবেশান আর এরপর ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত নাযের রিশতানাতা ছিলেন এবং ২০১৭ সালে অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহণ করেন। তার মাঝে তবলীগ করার, মানুষের সাথে কথাবর্তা বলার এবং বক্তৃতা করারও অনেক দক্ষতা ছিল। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যাতে তিনি বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী মানুষের সাথে এবং আলেম সম্প্রদায়ের সাথে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা হতো এবং অত্যন্ত যৌক্তিক ও জ্ঞানগর্ভ উত্তর প্রদান করতেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন, শ্রোতামণ্ডলীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারতেন। যেসব মুরব্বী তাঁর সাথে কাজ করেছেন তারাও একথাই লিখেছেন যে,তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে চলতেন। প্রত্যেকেই লিখেছেন, আমাদের সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। নিজেও তাহাজ্জুদ ও ইবাদত পালনকারী ছিলেন এবং অন্যদেরও, বিশেষ করে মুরব্বীদেরকে তাহাজ্জুদ ও ইবাদতের ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের এক অসাধারণ মানে তিনি উপনীত ছিলেন। চতুর্থ খিলাফতের যুগে তাকে কিছুটা পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে তিনি সেই যুগ অতিবাহিত করেন এবং অধীনস্ত থেকেও কাজ করেছেন। বরং কেউ তাকে বলেছেও যে, পূর্বে আপনি নাযের ছিলেন আর এখন অন্য কোন নাযেরের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে! কয়েকজন মুরব্বীও লিখেছেন এবং তার এক কন্যাও একথা লিখেছিলেন যে, তিনি তখন প্রত্যুত্তরে বলেন, যুগ-খলীফা ভালোভাবে জানেন, কার কোথায় কী প্রয়োজন। আমি জীবন উৎসর্গ করেছি, আমাকে যদি ঝাড়ু দেওয়ার কাজেও লাগানো হয়, আমি সেই কাজই করব, যার নির্দেশ যুগ-খলীফা প্রদান করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা অবস্থার উন্নতি ঘটান। আমার মতে তাঁর সেই পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের দৃষ্টান্ত কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করে আর তিনি পুনরায় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্যও হন এবং নাযের-ও হন। যেখানেই ছিলেন আমীরের সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও আনুগত্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, করাচিতেও এবং অন্যান্য স্থানেও। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন। তিনি সাহিত্যাঙ্গনেও বেশ কিছু কাজ করেছেন, পুস্তকাদি রচনা করেছেন। তার একটি বই হলো *'কালেমা তৈয়্যেবা কি আযমত কা কিয়াম আহ্‌মাদী কি প্যাহচান'* (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই একজন আহমদীর পরিচয়), আরেকটি পুস্তক হলো *'আল্লাহ্ তা'লা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.),কুরআনে করীম অওর খানা কা'বা'*, অন্য একটি বই হলো *'জামা'তে আহমদীয়া কি তা'দাদ কা মাসলা'*, আরেকটি বই হলো *'নাফাযে শরিয়্যত মেঁ নাকামি কে আসবাব'*, আরেকটি বই হলো *'তওহীনে রিসালাত কি সাযা'* যাহোক, তার এসব রচনাবলী রয়েছে, সাহিত্যাঙ্গনেও তিনি কাজ করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি খুবই নিখুঁত কাজ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা ও ক্ষমার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো কাদিয়ানের সাবেক নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের যিনি পি কে ইব্রাহীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনিও ২১ জানুয়ারি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** মরহুম কেরালার অধিবাসী

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

ছিলেন। তার পিতা ইব্রাহীম কুট্টি সাহেব জামা'তের চরম বিরোধী ও শত্রু ছিলেন। এই মওলানা সাহেবের জন্মের ১০ বছর পূর্বে তার পিতা ব্যবসার কাজে বোম্বে যান। সেযুগে বোম্বেতে অনেক আহমদী ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। বোম্বের মালাবারেরই কয়েকজন আহমদীর সাথে তার সাক্ষাত হয় এবং আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস সম্পর্কে মতবিনিময় হয় আর ১৯২৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন বোম্বে যান তখন হুযূরের বরকতময় হাতে বয়আত করে তিনি জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবতীতে তিনি কাদিয়ান যাওয়ারও তৌফিক পান।

মওলানা উমর সাহেব ১৯৫৪ সনে কাদিয়ানে আসেন, দেশ বিভাগের পর নুতনভাবে তখন মাদ্রাসা আহমদীয়া চালু হয়েছিল। তিনি ১৯৫৫ সনে মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সনে মাদ্রাসা আহমদীয়া এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করার পর ১ বছর পর্যন্ত মাদ্রাসার শিক্ষকতা করেন। ছাত্র জীবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রা.)-এর ইচ্ছায় প্রায় ১ বছর যাবৎ প্রতিদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পবিত্র কুরআন শোনানোর সৌভাগ্য মরহুম লাভ করেন। ১৯৬২ সন থেকে তিনি তবলীগের ময়দানে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। ভারতের বড় বড় শহরে কাজ করেন এবং অত্যন্ত সফল মুবাল্লেগ হিসেবে কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন। বিভিন্ন তবলীগি সভায় বক্তৃতা করতেন আর 'মুনাযেরা ইয়াদগিরী' -তেও তিনি অংশ নেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর বিশেষ পথনির্দেশনায় ৯ দিন ব্যাপি অব্যাহত কোম্বেটোর-এর ঐতিহাসিক মুনাযেরায় মওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব এবং কেন্দ্র থেকে আরেকজন প্রতিনিধি হাফেয মুজাফ্ফর সাহেবও গিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাদের সাথে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এক স্থানে তার কাজের প্রশংসা করে নিজের এক খুতবায় বলেছিলেন, কিছু কিছু জামা'ত এমন আছে যেখানে একজন মানুষই রয়েছে যিনি একাই তাৎক্ষণিকভাবে পুরো বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন আর অনুবাদ করে অজস্র ধারায় তা প্রচার করেন অর্থাৎ খুতবার অনুবাদ করে তাৎক্ষণিকভাবে (প্রচার করেন) আর খোদা তা'লার কৃপায় এমন জামা'তগুলো ক্রমশ উন্নতির দিকে ধাবমান, কেননা তারা তাৎক্ষণিকভাবে যুগ-খলীফার খুতবা পেয়ে যায়। এতে আমাদের পুরো জামা'ত জানতে পারে যে, কী হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে আমাদের এমন জামা'ত রয়েছে যারা উর্দু বোঝে না সেখানে আমাদের জামা'তের মুবাল্লেগ মৌলভী মুহাম্মদ উমর সাহেব রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ বিষয়ের উন্মাদনা দিয়ে রেখেছেন। (খুতবা) শুনা মাত্রই তিনি তা অনুবাদ করে তাৎক্ষণিভাবে গোটা জামা'তের কাছে পৌঁছে দেন। কাজেই অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি একাজ করতেন। তিনি প্রায় এক বছর ফিলিস্তিনেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। পবিত্র কুরআন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্রিকার মালয়ালম ও তামিল ভাষায় অনুবাদ করার তৌফিক পেয়েছেন। ২০০৭ সনে আমি তাকে নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া নিযুক্ত করি এবং এরপর এডিশনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ তালিমুল কুরআন এবং ওয়াকফে আরযী নিযুক্ত করি, এছাড়া নায়েব নাযের-এ আ'লা হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পান। তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে এসব দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসা আহমদীয়া থেকে পাশ করে বের হওয়ার পর মরহুম সর্বমোট ৫৩ বছর পর্যন্ত জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তার পেছনে চার কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং প্রদৌহিত্র-দৌহিত্রীও রেখে গেছেন। জামা'তী কাজ করার ক্ষেত্রে তার মাঝে এক প্রকার উন্মাদনা ছিল। পরিবারের সাথেও যখন কোন ব্যক্তিগত সফরে যেতেন তখন সফরের সময়ও জামা'তী কাজ, বিশেষত অনুবাদ প্রভৃতির কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, শ্রীলঙ্কা আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে সেই স্বর্ণযুগ সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বরকতময় নেতৃত্বে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ হিসেবে মওলানা সাহেবের প্রথম শুভাগমন ঘটেছিল ১৯৭৮ সালে । জামা'তের ভিতর তখন অসাধরণভাবে এক নতুন আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার সাথে সংশোধন ও পবিত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। সেখানে মরহুম মওলানা সাহেবের অমূল্য সেবা রয়েছে। ১৯৯৪ সালে কলম্বো শহরের রামকৃষ্ণের এক বিশাল হলে মওলানা সাহেবের 'শান্তি ও ঐক্য' শিরোনামে এমন জোরালো একটি বক্তৃতা হয়, যা শ্রবণের জন্য চার শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। বিশেষভাবে এই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের দেশীয় প্রধান এবং রাষ্ট্রের হিন্দু সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় দেবরাজ মরহুম মওলানা সাহেবের বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং অনেক প্রশংসা করতে থাকেন। কেননা এই বক্তৃতায় মওলানা সাহেব গীতা থেকে মন্ত্র পাঠ করে মহানবী (সা.)-এর সত্যতা সাব্যস্ত করেছিলেন। এজন্যই তার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি আজও তাদের নিকট জনপ্রিয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চারটি পুস্তক তিনি তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়া তিনি নিজে তামিল ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে সাতটি পুস্তক রচনা করেছেন। তামিলনাড়ু প্রদেশে জামা'তী পত্রিকা 'সামাদানা ওয়াজরী' চালু করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখান থেকে অন্যান্য প্রদেশে প্রকাশ করতে থাকেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকারতৌফিক দিন।

পরবতী জানাযা হলো মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোকাররম হাবীব আহমদ সাহেবের, যিনি রাবওয়ার ফ্যাক্টরী এরিয়া নিবাসী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি গত ২৫ ডিসেম্বর তারিখে ইসলামাবাদে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । তিনি ১৯৭৯ সালে জামেয়া পাশ করেন। এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলাতে তিনি কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়াতে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। তখন তিনি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০০০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত নাইজেরিয়া জামা'তের আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জও ছিলেন। তিনি বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক দায়িত্ব ছাড়া মহল্লার তরবিয়তী দায়িত্বও তিনি সুচারুরূপে পালন করতেন। তিনি স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন এবং তাঁর সন্তানসন্ততিকেও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা মোকাররম বদরুজ্জামান সাহেবের, যিনি কিছুকাল যাবৎ যুক্তরাজ্যের ওকালতে মাল-এর কর্মী ছিলেন। তিনি গত ৩ জানুয়ারি তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন; ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পরিশ্রমী কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন; জন্মগত আহমদী ছিলেন। সরকারী চাকুরিরত অবস্থায় তিনি কোয়েটা জেলার খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবাদানের সুযোগ লাভ করেন। এরপর বেলুচিস্তানের আনসারুল্লাহ্র নাযেম হিসেবেও সেবা করেছেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয় যার প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহ্র পথে বন্দিজীবন কাটানোর সম্মানও লাভ করেছেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাবওয়ার ওকালতে মাল আউয়াল এ সেবা করেছেন। এখানে লণ্ডনে আসার পর রক্বীম প্রেসে; অতঃপর ১৭ বছর লন্ডনের এডিশনাল ওকালতে মাল-বিভাগে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপা করুন।

পরবতী জানাযা মোকাররম মনসূর আহমদ তাসীর সাহেবের, যিনি মুরব্বী সিলসিলাহ্ মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেবের পুত্র ছিলেন এবং রাবওয়ার নাযারতে উমূরে আম্মার এহতেসাব বিভাগের কর্মী ছিলেন। তিনি এখানে লণ্ডনে তার পুত্রের কাছে এসেছিলেন এবং গত ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ৭০ বছর বয়সে নিয়তির বিধান অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তিনি জীবনের প্রায় পঁচিশ বছর ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে জামা'তের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরে সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। অত্যন্ত মিশুক, ধার্মিক এবং স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করতেন, অন্যদেরও এব্যাপারে নসীহত করতেন। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের সাথে বিষয়াদি মীমাংসা করতেন। সাধারণত জটিল বিষয়গুলো তার কাছে সোপর্দ করা হতো। কখনো কখনো উভয় পক্ষ রাগ ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দফতরে আসত, কিন্তু তার ভালোবাসা ও স্নেহের কারণে নিজেদের আবেগ ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতো আর তিনি বিষয় মীমাংসা করে দিতেন। জামা'তের সেবা করার এরূপ স্পৃহা ছিল যে, তার স্ত্রী লিখেন- তার কন্যা ডাক্তার ফারেহা মনসূর-এর ওলীমার দাওয়াত ছিল। সেদিন সকালে তিনি প্রস্তুত হয়ে দপ্তরের জন্য বের হতে গেলে স্ত্রী বলেন, এটি বিয়ে বাড়ি; আজ অন্তত ছুটি নিয়ে নিন। তিনি উত্তরে বলেন-দাওয়াতের সময় দুপুর দুটোয়; সময় নষ্ট করার কী প্রয়োজন? আমি এখন দপ্তরে যাচ্ছি, তখন চলে আসব। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। কোন বিষয়ে মতের অমিল হলে সম্মানের দাবি বজায় রাখতেন এবং সর্বদা ব্যক্তিগতমত প্রকাশ করতেন। স্ত্রী রুখশান্দা সাহেবা, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা তার পেছনে রেখে

গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

বাল্যকাল থেকেই আমি তাকে চিনি। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। সর্বদা আমি দেখেছি, তার মাঝে বড়ই ভদ্রতা ছিল আর রসবোধ ছিল, কখনো রাগ না করা, বিবাদে না জড়ানো (ছিল তার বৈশিষ্ট্য আর) এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত তার মাঝে ছিল। যার ফলে তিনি মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো তানজানিয়ার ডাক্তার ঈদী ইব্রাহীম মুয়াঙ্গা সাহেবের, যিনি ৯ ডিসেম্বর তারিখে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। উগান্ডার মেকরেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল বিভাগে ভর্তি হন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পূর্ব আফ্রিকার প্রথম স্থানীয় আহমদী ডাক্তার হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ডাক্তার সাহেব তার যৌবনকালে-ই বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। স্কুলজীবন থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশ গ্রহণ করতেন। তথাকথিত ইসলামী পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে অগণিত আপত্তির কারণে তার হৃদয়ে জামা'ত সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে যুগেই মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ শেখ আবু তালেব সান্দি সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি তার আত্মীয়ও ছিলেন। তার সাথে যখন সেসব আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন শেখ সাহেব কেবল বিস্তারিতভাবে সেসব মনগড়া আপত্তিরই উত্তর প্রদান করেন নি, বরং আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের সোয়াহিলী ভাষায় অনুবাদ এবং অন্যান্য পুস্তকও তাকে দেখান। এসব পুস্তক অধ্যয়নের পর ডাক্তার সাহেব বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি তার বয়আতের অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন করেন। সর্বদা সকল স্তরের লোকদের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কাজে রত থাকতেন। তবলীগের জন্য তার হৃদয়ে এক উদ্দীপনা ছিল, যার কারণে আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রায়ই নিজের ব্যাগে করে জামা'তী বই-পুস্তক ও পত্রিকা বাজারে নিয়ে যেতেন এবং বিক্রি করতেন। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করত, (আপনি) ডাক্তার হয়েও এখানে বই-পুস্তক বিক্রি করছেন? এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দঘন কণ্ঠে উত্তর দিতেন যে, আমি যখন হাসপাতালে থাকি তখন দেহের চিকিৎসা করি আর এখন আমি আত্মার চিকিৎসা করছি। এ দু'টি বিষয়কে পৃথক করাও সম্ভব নয় আর দু'য়ের মধ্যে একটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। খিলাফতের প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক। সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে লালনপালন করেছেন। (তাদের) তা'লীম-তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন; এছাড়া বাড়িতে সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত বাজামাত নামাযও পড়তেন। বাড়িতে একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তকের পাশাপাশি জামা'তের বই-পুস্তকাদি রেখেছিলেন। নিজ সন্তানদের আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে নিজেও দোয়া করতেন আর অন্যদেরও (দোয়ার জন্য) অনুরোধ করতেন। জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন। তার সন্তানরাও সবাই জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে আর তাদের পিতার মতোই সৎ প্রকৃতির। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সর্বদা (জামা'তের সাথে) সম্পৃক্ত রাখুন আর তারা তাদের পিতার যাবতীয় দোয়া ও পুণ্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী হোক। পাশাপাশি ডাক্তার সাহেবের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো, কাদিয়ানের দরবেশ দ্বীন মুহাম্মদ নাঙ্গালী সাহেবের সহধর্মিণী সুগরা বেগম সাহেবার। গত ৬ জানুয়ারি তারিখে ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাকীম মুহাম্মদ রমজান সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি নামায-রোযায় নিয়মিত, তাহাজ্জুদগুযার, অতিথিপরায়ণা, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, পরিশ্রমী, সহানভূতিশীলা এবং আরো অনেক গুণের আধার একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কয়েকবছর যাবত লাজনা ইমাইল্লাহ্র সেক্রেটারী খিদমতে খালক হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে দু'পুত্র ও দু'কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র বশীর উদ্দীন সাহেব চল্লিশ বছর যাবত (জামা'তের) সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। অপর ছেলে মুনীর উদ্দীন (সাহেব) বর্তমানে কাদিয়ানে নিযামে তা'মীরাত বা নির্মাণ বিভাগের অধীনে সেবারত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানসন্ততিকে তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো, শ্রদ্ধেয় চৌধুরী কেরামত উল্লাহ্ সাহেবের; যিনি গত ২৬ ডিসেম্বর তারিখে ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন; ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘাটিয়ালিয়াঁ নিবাসী সাহাবী হযরত চৌধুরী শাহ্ দ্বীন সাহেব এর পৌত্র ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়ালকোট আগমনের সময় বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মরহুম ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র আর নিঃস্বার্থভাবে (মানুষকে) ভালোবাসতেন। তিনি গরীবের বন্ধু, অভাবীদের সাহায্যকারী এবং সর্বাবস্থায় খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ একজন নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন।

তার পুত্র সোহেল সাহেব লিখেন, তার মধ্যে অতিথিসেবার গুণটি ছিল অনন্য। আর এর বহিঃপ্রকাশ বিশেষভাবে তখন ঘটতো যখন ওয়াকেফে জিন্দেগীরা জামা'তী সফরে সিন্ধুর বদীনে আসতেন। তিনি ফুরকান ফোর্সেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আল্-ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর অফিসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। শুরু থেকেই নিজের বাড়ি জামা'তী অনুষ্ঠানাদির জন্য দিয়ে রেখেছিলেন আর বর্তমান বাড়িতেও একটি অংশ নামায সেন্টারের আদলে বানিয়েছেন। তার মেয়েরাও (জামা'তের) সেবায় নিবেদিত রয়েছেন আর ছেলেও জামা'তের কাজ করছেন। তার দৌহিত্রদের একজন ফরহাদ আহমদ সাহেব জামা'তের মুরব্বী হিসেবে এখানেই যুক্তরাজ্যে (কেন্দ্রীয়) প্রেস এণ্ড মিডিয়া বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরকে তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবতী জানাযা জার্মানীর চৌধুরী মুনাওয়ার আহমদ খালিদ সাহেবের যিনি গত ২০ আগস্ট ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন***। জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে মরহুমের গভীর সম্পর্ক ছিল। তবলীগি ও তরবিয়তী কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। জার্মানীতে বিভিন্ন সময় তিনি প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করেছেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্তেও বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া পাকিস্তানে থাকাকালেসেখানে তাহরীকে জাদীদের জমিজমায় ম্যানেজার হিসেবেও তার কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও পাঁচ পুত্র এবং ছয় কন্যা রয়েছে।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো, নাসিরা বেগম সাহেবার, যিনি বাংলাদেশের অবসর প্রাপ্ত মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি গত ২৭ নভেম্বর তারিখে ঐশী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন; ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । মরহুমা প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি নামায-রোযায় নিয়মিত, দোয়ায় অভ্যস্ত, অতিথিপরায়ণ, ধৈর্যশীলা এবং কৃতজ্ঞতাপরায়ণ একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন। রমজান মাসে নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং কুরআন খতম করতেন। এছাড়াও তিনি আরো বহু গুণাবলীর ধারকবাহক ছিলেন এবং পুণ্যে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও মাগফিরাত করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো, রফিউদ্দিন বাট সাহেবের, যিনি গত ৬ ডিসেম্বর তারিখে ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*** । তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী খয়ের দ্বীন সাহেব (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি যৌবনেই ওসীয়্যত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মরহুম বিভিন্ন পদে জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি নারওয়াল জেলার বাদ্দোমালি জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং হালকার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াহ্ ক্যান্ট (সেনা ছাউনি) জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্র পথে কারাবন্দী হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে চার কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছে। তার এক জামাতা নাসীম আহমদ সাহেব মুবাল্লেগ হিসেবে নাইজেরিয়াতে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ প্রিয়দের সান্নিধ্যে স্থান দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

জুমআর খুতবা

হযরত ওসমান মক্কার কাফেরদের বললেন, এটি কিভাবে হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে মক্কার বাইরে বাধা দেওয়া হবে আর আমি তওয়াফ করব?

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ, যুন নুরাইন হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

গাতফান ও উহদ-এর যুদ্ধ, বয়আতে রিযওয়ান এবং হুদায়বিয়া সন্ধির পটভূমিকা ও ঘটনার বর্ণনা।

আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'যদি এই সংবাদ সঠিক হয়ে থাকে তবে খোদার কসম! আমরা এই জায়গা হতে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বো না যতক্ষণ উসমানের (হত্যার) প্রতিশোধ না নিই। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, আস এবং আমার হাতে হাত রেখে এই অঙ্গীকার কর যে, তোমাদের কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না এবং নিজ জীবন বাজি রেখে লড়াই করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিজ স্থান ত্যাগ করবে না।'

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৯ জানুয়ারী,, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা ২৯ সুলাহা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উসমান (রা.)-এর বিভিন্ন যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে উল্লেখ করছি। যেমনটি বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেন নি কেননা, তার সহধর্মিণী রসূল তনয়া হযরত রুকাইয়া (রা.) গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, তাই মহানবী (সা.) তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাঁকে (রা.) মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে (রা.)বদরের (যুদ্ধে) যোগদানকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) তার জন্য বদরের (যুদ্ধে) অংশগ্রহণকারীদের মতই যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ও পুরস্কারে অংশ নির্ধারণ করেছেন। (শারাহ আল্লামা যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪)

তৃতীয় হিজরীর মহররম বা সফরে (মাসে) গাতফানের যুদ্ধ হয়। গাতফানের যুদ্ধের জন্য নজদ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন আর এ কারণে তিনি এতেও যোগদান করেন নি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ এভাবে দিয়েছেন, বনু গাতফানের কোন কোন গোত্র অর্থাৎ বনু সা'লাবাহ্ এবং বনু মোহারেব এর সদস্যরা তাদের একজন নামকরা যোদ্ধা দ'সুর বিন হারেস এর আহ্বানে মদীনার ওপর অতর্কিতে হামলা করার দুরভিসন্ধি নিয়ে নজদ এর একটি স্থান 'যী আমর' এ সমবেত হতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) যেহেতু তাঁর শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর রাখতেন (তাই) তিনি (সা.) সময়মত তাদের এই হিংস্র অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হন আর তিনি একজন বিচক্ষণ সেনানায়কের মতো আগাম ব্যবস্থা হিসেবে সাড়ে চারশ' সাহাবীর একটি দলকে নিজের সাথে নিয়ে ৩য় হিজরীর শেষ দিকে অথবা সফর মাসের প্রারম্ভে মদীনা হতে যাত্রা করেন এবং দ্রুত গতিতে সফর করে 'যী আমর' এর কাছাকাছি পৌঁছে যান। শত্রুরা তাঁর আগমন সংবাদ পেতেই তড়িৎ গতিতে পার্শ্ববর্তী টিলায় উঠে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয় আর মুসলমানরা 'যী আমর'এ পৌঁছার পর দেখে ময়দান ফাঁকা। তবে, বনু সা'লাবাহ্'র জব্বার নামের একজন বেদুঈন সাহাবীদের হাতে ধরা পড়ে, (তারা) তাকে বন্দি করে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তার কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করলে জানা যায় বনু সা'লাবাহ্ এবং বনু মোহারেব এর সকল সদস্য পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে মুসলমানদের সামনে আসবে না। অগত্যা মহানবী (সা.)-কে (নিজ বাহিনীকে) ফিরে আসার নির্দেশ দিতে হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের এতটুকু লাভ অবশ্যই হয়েছে, অর্থাৎ সে সময় গাতফান গোত্রের পক্ষ থেকে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল- তা সাময়িকভাবে টলে যায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৬৩)

উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে। হযরত উসমান (রা.) উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দু'টি যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন নি কিন্তু এতে অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে সাহাবীদের একটি দল এমন ছিল যারা অতর্কিত হামলা এবং মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন আর এমনও একটি সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে মাত্র ১২জন সাহাবীর ছোট্ট একটি দল রয়ে গিয়েছিল। হযরত উসমান প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (শারাহ আল্লামা যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ:৪১৮-৪১৯)

মুসলমানরা যখন কুরাইশদের বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে আর তারা গনিমতের মাল একত্রিত করার কাজে রত হয় তখন মহানবী (সা.) যে পঞ্চাশজন তিরন্দাজকে নিজ স্থান পরিত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন তারা বিজয় দেখে নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে, অথচ মহানবী (সা.) তাদেরকে নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করতে কঠোরভাবে বারণ করেছিলেন। খালেদ বিন ওয়ালীদ, যিনি তখনও মুসলমান হন নি, তিনি এই দৃশ্য দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সেদিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ এত অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত এবং এমন প্রবল ছিল যে, মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ছত্রভঙ্গ সাহাবীদের মাঝে হযরত উসমানের নামও উল্লেখ করা হয়। পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে যে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি এবং তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۔ (آل عمران:156)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, যেদিন দুদল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিল, নিশ্চয় তাদের কোন কোন কৃতকর্মের দরুন শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করতে চেষ্টা করেছিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মার্জনা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।" (সূরা আলে ইমরান: ১৫৬)

এই যুদ্ধকালে মুসলমানদের উক্ত অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেন,

কুরাইশ বাহিনী প্রায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল আর নিজেদের মুহুর্মুহু আক্রমণে প্রতি মুহূর্তে চাপ বৃদ্ধি করছিল। তাতেও মুসলমানরা হয়ত কিছু সময় পর সামলে উঠতে পারত, কিন্তু সর্বনাশ এটি হয়েছে যে, কুরাইশদের এক সাহসী সৈনিক আব্দুল্লাহ্ বিন কামেয়া মুসলমানদের পতাকাবাহক মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করে এবং নিজ তরবারির আঘাতে তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে। মুসআব (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে পতাকা অপর হাতে নিয়ে নেন আর ইবনে কামেয়ার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু সে দ্বিতীয় আঘাতে তার অপর হাতও ছিন্ন করে দেয়। এতে মুসআব নিজের দুই কর্তিত হাত একত্রিত করে পতনোন্মুখ ইসলামী পতাকাকে সামলানোর চেষ্টা করেন এবং সেটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। তখন ইবনে কামেয়া তাঁর ওপর তৃতীয় আঘাত হানে আর এবার মুসআব শহীদ হয়ে পড়ে যান। যদিও অন্য একজন মুসলমান তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রসর হয়ে পতাকা হাতে নিয়ে নেন, কিন্তু যেহেতু মুসআবের গঠন-গড়ন মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, তাই ইবনে কামেয়া ধরে নিয়েছে যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। অথবা

হতে পারে এটি তার পক্ষ থেকে দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলকভাবে হয়ে থাকবে। যাহোক মুসআবের শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়ায় সে চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আমি মু হাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এই সংবাদে মুসলমানদের বাদবাকি সম্বিতটুকুও হারিয়ে যেতে থাকে এবং তাদের ঐক্য পুরোপুরি হারিয়ে যায়। আর বহু সাহাবী হতভম্ব হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করে। তখন মুসলমানরা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল তাদের, যারা মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিল আর এই দলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম। অথবা বলা যায় যে, তারা হতাশায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে হযরত উসমান বিন আফফানও ছিলেন। কিন্তু যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে যে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি এবং তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের মাঝ থেকে কেউ কেউ মদীনায় পৌঁছে যায়। আর এভাবে মদীনায়ও মহানবী (সা.)-এর কাল্পনিক শাহাদাত এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে যায়, যার ফলে পুরো শহরে শোক পালন আরম্ভ হয়ে যায় আর মুসলমান আবাল বৃদ্ধ বণিতা অতিশয় দুঃখে উন্মাদের ন্যায় শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং উহুদের দিকে যাত্রা করে। আর কেউ কেউ দ্রুত দৌড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রু-সারিতে ঢুকে পড়ে। দ্বিতীয় দলে তারা ছিল, যারা পলায়ন না করলেও, মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে হয় হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল অথবা এখন যুদ্ধ করাকে নিরর্থক মনে করেছিল। তাই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে একপাশে মাথা নিচু করে বসে পড়েন। তৃতীয় দল ছিল তাদের, যারা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। তাদের মাঝে কতিপয় এমনও ছিল, যারা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত ছিল এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল; আর অধিকাংশ ছিল এমন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করছিল। এরা এবং একইসাথে দ্বিতীয় দলের লোকেরাও যতই মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার সংবাদ পাচ্ছিল ততই উন্মাদের ন্যায় লড়তে লড়তে তাঁর (সা.) চতুর্দিকে একত্রিত হচ্ছিল। সে সময়ে যুদ্ধের অবস্থা এমন ছিল যে, কুরাইশদের সেনাবাহিনী সমুদ্রের ভয়াল ঢেউয়ের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সকল দিক থেকে তির এবং পাথর বর্ষিত হচ্ছিল। এরূপ বিপদসংকুল অবস্থা দেখে উক্ত নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর চারদিক ঘেরাও করে তাঁর পবিত্র দেহের চারপাশে মানব-বর্ম তৈরি করে ফেলেছিল। তথাপি যখনই আক্রমণের ঢেউ আসত তখন এই গুটিকতক লোককে ধাক্কা দিয়ে এদিক সেদিক সরিয়ে দেওয়া হতো আর এরূপ অবস্থায় কয়েকবার এমন হয়েছে যে, মহানবী (সা.) প্রায় একাই রয়ে যেতেন। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৩-৪৯৪)

যাহোক বলা হয় যে, তখন হযরত উসমান হতাশ হয়ে অথবা অন্য কোন কারণে মহানবী (সা.) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হতাশ হয়ে বসে পড়া লোকদের মাঝে হযরত উমরেরও (রা.) উল্লেখ পাওয়া যায়; যাহোক সেটা যথাসময়ে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং বয়আতে রিযওয়ান হয়েছিল, তাতে হযরত উসমান (রা.)-এর ভূমিকা বা তাঁর সম্পর্কে কী কী তথ্য পাওয়া যায়, তা উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে এবং চুল ছেঁটে বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশ করছেন। এই স্বপ্নের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে স্বীয় চৌদ্দশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি দেন। কুরাইশরা মহানবী (সা.) কে ওমরাহ্ করতে বাধা প্রদান করে। দুই পক্ষের মাঝে যখন কূটনৈতিক আলোচনার সূচনা হয় এবং মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের উত্তেজনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) বলেন এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করা হোক যিনি মক্কার অধিবাসী হবেন এবং কুরাইশদের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হবেন। (শারাহ আল্লামা যারকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ:১৬৯-১৭০)

কাজেই তখন হযরত উসমান (রা.)-কে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব এর যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছুটা এখানে বর্ণনা করছি। তিনি (রা.) লিখেন

"মহানবী (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি নিজের সাহাবীদের সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছেন। তখন যিলক্বদ মাস খুব নিকটে ছিল, যাকে অজ্ঞতার যুগেও সেই চারটি পবিত্র মাসের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা হতো যেগুলোতে সর্বপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিষিদ্ধ । অর্থাৎ একদিকে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন আর অপর দিকে সময়ও এমন ছিল যে, আরবের চতুসীমায় যুদ্ধ-বিগ্রহ থেমে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসত। যদিও তখন হজ্জের সময়ও ছিল না এবং তখনও পর্যন্ত ইসলামে হজ্জব্রত পালন যথারীতি নির্ধারিত হয় নি, কিন্তু বায়তুল্লাহ শরিফের তোয়াফ সব সময়ই করা যেত। তাই তিনি (সা.) এই স্বপ্ন দেখার পর নিজ সাহাবীদেরকে উমরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। সেই মুহূর্তে তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাও প্রদান করেন যে, যেহেতু এই সফরে কোন ধরনের যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নেই বরং কেবল এক শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় ইবাদাত পালন করা অভিপ্রায়, তাই মুসলমানদের এই সফরে কোন ধরনের অস্ত্র সাথে নেওয়া উচিত হবে না, তবে হ্যাঁ, আরবদের রীতি অনুযায়ী কেবল নিজেদের তরবারি খাপে আবদ্ধ করে মুসাফেরদের মত নিজেদের সাথে রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি তিনি (সা.) মদীনার চতুর্দিকে বসবাসরত বেদুঈন লোকদেরও সাথে গিয়ে উমরাহ করার আহবান জানান- যারা বাহ্যত মুসলমানদের সাথে ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অতি অল্পসংখ্যক, নাম মাত্র কিছু লোক ব্যতিত মদীনার আসপাশে বসবাসকারী ঐ সকল দুর্বল ইমানের অধিকারী তথাকথিত মুসলমান বেদুঈনরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হতে অস্বীকৃতি জানালো। কেননা তাদের ধারণা ছিল, যদিও মুসলমানরা উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে না, কিন্তু কুরায়শরা অবশ্যই মুসলমানাদেরকে বাধা প্রদান করবে আর এভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তারা এ-ও ভাবছিল যে, যেহেতু এই মোকাবিলা মক্কার অদূরে এবং মদীনা থেকে দূরে হবে, তাই কোন মুসলমান জীবিত ফিরতে পারবে না- এই ভয়ে তারা উক্ত কাফেলায় যোগ দেয় নি। যাইহোক, মহানবী (সা.) প্রায় চৌদ্দশত সাহাবীর একটি দল নিয়ে যুল কা'দার ছয় হিজরীর প্রারম্ভে সোমবার প্রভাতে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। এই সফরে তাঁর সহধর্মিণী মোহতারমা হযরত উম্মে সালেমা (রা.) তাঁর সহযাত্রী ছিলেন আর মদীনার আমীর হিসেবে নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)কে এবং ইমামুস সালাত হিসেবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আব্দুল্লাহ্ বিন মাকতুম (রা.) কে নিযুক্ত করে যান।

মদীনা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরত্বে মক্কার পথে অবস্থিত যুল হুলায়ফা'য় গিয়ে পৌঁছে তিনি যাত্রাবিরতির আদেশ দেন এবং যোহর নামায আদায় শেষে কুরবানীর উটগুলোকে চিহ্নিত করার নির্দেশ প্রদান করেন, যা সংখ্যায় ছিল ৭০টি এবং সাহাবীদেরকে হাজীদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পোষাক পরিধানের নির্দেশ দেন যাকে পারিভাষাগতভাবে এহরাম বাঁধা বলা হয় এবং তিনি স্বয়ং এহরাম পরিধান করেন। অতঃপর কুরায়েশের অবস্থা নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে, একথা চিন্তা করে যে পাছে তাদের কোন দুরভিসন্ধি থাকে, মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বুসর বিন সুফিয়ান নামে খুযাআ গোত্রের এক সদস্যকে বার্তাবাহকরূপে অগ্রে প্রেরণ করে ধীরে ধীরে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে মুসলমানদের বড় দলের অগ্রভাগে থাকার জন্য আব্বাদ বিন বিশরের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্রদলও নিযুক্ত করেন। যখন মহানবী (সা.) কয়েকদিনের যাত্রা শেষে আসফানের কাছে উপনীত হন, যেটি মক্কা থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল বা ১৮ মাইল দূরত্বে পৌঁছেন তখন বার্তাবাহক ফেরত এসে মহানবী (সা.)কে অবগত করেন যে, মক্কার কুরায়েশরা খুব উত্তেজিত এবং আপনাকে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমনকি তাদের মাঝে অনেকে নিজেদের উত্তেজনা এবং হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশার্থে চিতার চামড়া পরিধান করে রেখেছে এবং যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প করে মুসলমানদেরকে যে কোন উপায়ে বাধা প্রদান করতে মনঃস্থির করেছে। এটিও জানা গেছে যে, কুরায়শরা নিজেদের কতিপয় আত্মত্যাগী অশ্বারোহীর এক ক্ষুদ্রদল খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে সম্মুখে প্রেরণ করেছে যিনি তখনও মুসলমান হন নি;আর সম্ভবত সেই ক্ষুদ্রদল মুসলমানদের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে, এছাড়া সেই দলে একরামা বিন আবু জেহেলও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মহানবী (সা.) এই খবর শুনে সংঘাত এড়াতে সাহাবীদেরকে এই আদেশ দিলেন যে, তারা যেন মক্কার পরিচিত পথ না নিয়ে ডান দিকে গিয়ে যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়। অতএব মুসলমানরা একটি কঠিন ও দুর্গম পথে সমুদ্রকূল ঘেঁষে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। মহানবী (সা.) যখন সেই নতুন পথ পাড়ি দিয়ে হুদায়বিয়ার নিকটে উপনীত হন, যা মক্কা থেকে এক মঞ্জিল অর্থাৎ কেবল নয় মাইল দুরত্বে অবস্থিত এবং হুদায়বিয়ার ঘাঁটি থেকে মক্কার উপত্যকার সূচনা হয়ে যায়; তখন হঠাৎ করে 'কুসওয়া' নামে পরিচিত আঁ হযরত (সা.)-এর উটনীটি পা ছড়িয়ে হাঁটু গেঁড়ে মাটিতে বসে পড়ে-যা তিনি (সা.) বহু যুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। শত চেষ্টা করেও তাকে দাঁড় করানো যাচ্ছিল না। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, সম্ভবত সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.) বললেন, না না, এটি ক্লান্ত হয়নি। আর এভাবে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়া এর অভ্যাসও না। বরং আসল বিষয় হলো, এর পূর্বে যে মহান সত্তা আসহাবে ফীল-এর হাতিকে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিলেন, তিনিই এখন এই উটনীকেও থামিয়েছেন। অতএব আল্লাহর কসম! মক্কার কুরাইশরা বায়তুল হারামের সম্মানার্থে যে দাবীই আমার কাছে উত্থাপন করবে, আমি তা মেনে নিব। এরপর তিনি তাঁর উটনীকে

পুনরায় দাঁড়ানোর আদেশ দিলেন। আর আল্লাহর কি মহিমা! এবার সে ততক্ষনাৎ উঠে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। তারপর তিনি তাকে হুদায়বিয়া উপত্যকার অপর প্রান্তে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি ঝরনার নিকটে থেমে উটনী থেকে নিচে নামলেন এবং সেখানেই তাঁর নির্দেশে সাহাবীগণ শিবির স্থাপন করেন।

কুরাইশদের সাথে সন্ধির আলোচনার সূচনা কীভাবে হয়, তা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। মহানবী (সা.) হুদায়বিয়া উপত্যকায় পৌঁছে উপত্যকার ঝর্ণার পাশে শিবির স্থাপন করেন। যখন সাহাবীগণ সেখানে শিবির স্থাপন করেন তখন খোযা'আ গোত্রের বোদাইল বিন ওয়ারাকা নামের একজন প্রসিদ্ধ নেতা, যে কাছের এলাকাতেই বাস করতো, তার কিছু সঙ্গীসহ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে। সে তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করে, মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা আপনাকে কখনোই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। তিনি (সা.) বলেন, আমরা তো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসি নি বরং কেবল উমরার উদ্দেশ্যে এসেছি। পরিতাপ! যুদ্ধের আগুন মক্কার কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলেছে, তবুও এরা নিবৃত্ত হয় না; আমি তো তাদের সাথে এই সন্ধির জন্য প্রস্তুত যে- তারা যেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে আর আমাকে অন্যদের বিষয়ে বাধা না দেয়। মক্কাবাসীদের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। তাদের সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখব না আর অন্যদের মাঝে ইসলামের বার্তা পৌঁছাব। কিন্তু যদি তারা আমার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখে তবে আমিও সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিব না যতক্ষণ না এপথে আমার জীবন উৎসর্গিত হয় অথবা খোদা আমাকে বিজয় দান করেন। আমি যদি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই তাহলে তো ঝামেলা শেষ। কিন্তু যদি খোদা তা'লা আমাকে জয়যুক্ত করেন এবং আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিজয় লাভ করে তাহলে মক্কাবাসীদেরও ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন ধরণের দ্বিধাদ্বন্দ থাকা উচিত হবে না। বুদায়েল বিন ওয়ারাকার ওপর মহানবী (সা.)-এর এই আন্তরিক এবং বেদনাদায়ক বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়ে এবং সে তাঁর (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে, আপনি আমাকে সামান্য অবকাশ দিন, আমি যেন মক্কা গিয়ে আপনার এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারি এবং সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করতে পারি। তিনি (সা.) অনুমতি দিলেন। বুদায়েল তার গোত্রের কতক ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওনা হয়।

বুদায়েল বিন ওয়ারাকা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, আমি সেই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে আসলাম। তিনি আমার কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। আপনাদের অনুমতি পেলে আমি তা উল্লেখ করি। জবাবে কুরাইশদের উত্তেজিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা বলতে থাকলো, আমরা এই ব্যক্তির কোন কথা কানে তুলতে চাই না।কিন্তু বুদ্ধিমান এবং দায়িত্বশীল নেতারা বললো, 'ঠিক আছে তার প্রস্তাব আমাদের শুনাও। অতএব, বুদায়েল হুযূর (সা.) এর প্রস্তাব পুনরায় তাদের সামনে পড়ে শুনাল। উরওয়া বিন মাসুদ নামে সাকিফ গোত্রের এক প্রভাবশালী নেতা তখন মক্কায় ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে আরবদের প্রাচীন রীতিতে বললেন, হে লোকেরা আমি কি তোমাদের পিতার মত নই? তারা বললো, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও? তারা বললো, হ্যাঁ। পুনরায় উরওয়া বললেন, তোমারা কি আমাকে কোনভাবে অবিশ্বাস করতে পার? কুরাইশরা বললো, কখনোই না। তখন তিনি বললেন, 'তাহলে আমি মনে করি এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের সামনে একটি উত্তম প্রস্তাব রেখেছেন। তাঁর প্রস্তাব তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গিয়ে আলোচনা করতে পারি।' কুরাইশরা বললো, ঠিক আছে আপনি আমাদের পক্ষ থেকে গিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করুন।

সে যখন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন সেখানে এক প্রাণোদ্দীপক দৃশ্য দেখে। উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয় এবং তাঁর (সা.) সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। সে মহানবী (সা.)-এর সামনে সেই বক্তব্যেরই পুণরাবৃত্তি করে- যা এর আগে বুদায়েল বিন ওয়ারকা-র সামনে উপস্থাপন করেছিল। উরওয়া মূলত মহানবী (সা.)-এর অভিমতের সাথে একমত ছিল। কিন্তু কুরাইশের পক্ষে দূতের দায়িত্ব পালন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় যত বেশি সম্ভব শর্ত মানানোর চেষ্টায় ছিল। উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাথে আলোচনা শেষ করে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়েই বলে, হে লোকেরা! আমি জীবনে অনেক সফর করেছি। রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলাম। কায়সার, কিসরা, নাজ্জাসীর দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলেছি। কিন্তু খোদার কসম, যেভাবে আমি মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীদের তাঁকে সম্মান করতে দেখেছি এরকম আর কোথাও দেখিনি। এরপর সে তার পুরো অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে- যা মহানবী (সা.) এর সভায় দেখেছে। পরিশেষে বলে, আমি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি, মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব একটি ন্যায়নিষ্ঠ প্রস্তাব তাই এটি গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।

উরওয়া-র এই কথাগুলো শুনে বনূ কিনানা-র হুলাইস বিন আলকামা নামের এক নেতৃস্থানীয় কুরাইশ তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'আপনারা অনুমতি দিলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে চাই।' তারা বলল, 'নিঃসন্দেহে যেতে পার।' অতঃপর সেই ব্যক্তি হুদায়বিয়া-তে আসে আর মহানবী (সা.) তাকে দূর থেকে দেখেই সাহাবীদেরকে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দিকে আসছে সে এমন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে যারা কুরবানীর দৃশ্য পছন্দ করে। সুতরাং তোমরা অতিসত্বর নিজেদের কুরবানীর পশুগুলোকে একত্র করে তার সামনে নিয়ে আস যাতে সে বুঝতে পারে এবং অনুধাবন করে, আমরা কী উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছি। অতএব সাহাবীরা যখন নিজেদের কুরবানীর পশুগুলোকে হাঁকিয়ে এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করে তার সামনে একত্রিত হয় তখন সে এই দৃশ্য দেখে বলে, সুবহানাল্লাহ্ সুবহানাল্লাহ্! এরা তো হাজী। বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা থেকে এদেরকে কোনভাবে বিরত রাখা যেতে পারে না। অতঃপর সে দ্রুত কুরাইশদের মাঝে ফিরে যায় এবং বলতে থাকে, আমি দেখেছি, মুসলমানেরা নিজেদের পশুগুলোর গলায় কুরবানীর মালা বেঁধে রেখেছে এবং সেগুলোর গায়ে কুরবানীর চিহ্ন লাগিয়ে রেখেছে। সুতরাং তাদেরকে কা'বা শরীফের তাওয়াফ থেকে বিরত রাখা কোনভাবেই সমীচীন হবে না।

কুরাইশদের মাঝে তখন চরম বিভক্তি দেখা দিচ্ছিল এবং লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল মুসলমানদেরকে যে কোনও মূল্যে ফেরত পাঠাতে ও যুদ্ধ করার বিষয়ে ছিল বদ্ধপরিকর। কিন্তু অন্যদল এটিকে নিজেদের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী পেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল এবং একটি সম্মানজনক সমঝোতার আকাঙ্ক্ষী ছিল। এ কারণে সিদ্ধান্ত ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে ছিল।তখন মিকরিয বিন হাফ্স নামী এক আরব নেতা কুরায়েশকে বলে, আমাকে যেতে দাও, আমি মীমাংসার কোন পথ বের করবো। কুরায়েশরা বলল, ঠিক আছে তুমিও চেষ্টা করে দেখ। অতঃপর সে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। মহানবী (সা.) দূর থেকে তাকে দেখে বলেন, আল্লাহ ভালো করুন, এই ব্যক্তি তো ভালো নয়। যাহোক, মিকরিয তার কাছে এসে আলোচনা আরম্ভ করে কিন্তু তার আলোচনা চলাকালেই মক্কার এক বিশিষ্ট নেতা সুহায়েল বিন আমর মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়- যাকে সম্ভবত কুরায়েশরা ভীতবিহ্বল হয়ে মিকরিযের অপেক্ষা না করেই পঠিয়ে দিয়েছিল। মহানবী (সা.) সুহায়েলকে আসতে দেখে বলেন, সুহায়েল আসছে। এখন আল্লাহ চাইলে বিষয় সহজ হয়ে যাবে।

যাহোক, এই আলোচনা অব্যহত থাকে। তখন এই ঘটনাও ঘটে যে, কুরায়েশদের পক্ষ থেকে যখন একের পর এক দূত আসতে থাকে তখন মহানবী (সা.) অনুভব করেন, তাঁর পক্ষ থেকেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কুরায়েশদের কাছে যাওয়া উচিত, যে তাদেরকে সহমর্মিতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাতে পারবে। মহানবী (সা.) খারাশ বিন উমাইয়া নামী এক ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য নির্বাচন করেন যে খুযাআ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো। অর্থাৎ সেই গোত্র যার সাথে কুরায়েশের পক্ষ থেকে আগত সর্বপ্রথম দূত বুদায়েল বিন ওয়ারকা-র সম্পর্ক ছিল। এ উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.) খারাশকে বাহন হিসাবে নিজের একটি উট প্রদান করেন। খারাশ কুরায়েশের কাছে যায় কিন্তু যেহেতু তখনও আলোচনার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল আর কুরায়েশের যুবকেরা খুবই উত্তেজিত ছিল, এক উত্তেজিত যুবক ইকরামা বিন আবু জাহল খারাশের উটের ওপর হামলা করে সেটিকে আহত করে দেয়। আরবদের রীতি অনুসারে এর অর্থ ছিল, আমরা তোমাদের গতিবিধিকে বাহুবলে বাধা দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, কুরায়েশের এই ক্ষেপাটে দল খারাশের ওপরও আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও বয়স্করা মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তার প্রাণ রক্ষা করে আর তিনি ইসলামী শিবিরে ফিরে আসেন অর্থাৎ কাফেরদের কাছ থেকে তিনি ফিরে আসেন। মক্কার কুরায়েশরা এতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিজেদের উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে এ বিষয়েরও সংকল্প করে যে, এখন মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা মক্কার এতটা নিকটে এবং মদিনার এত দূরে এসে অবস্থান করছেন তাই তাদের ওপর আক্রমণ করে যথাসম্ভব ক্ষতি সাধন করা যায়। অতএব তারা এ উদ্দেশ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল হুদায়বিয়া অভিমুখে প্রেরণ করে আর তখন উভয় পক্ষের মাঝে যে আলোচনা চলছিল এর ছদ্মাবরণে তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, ইসলামী শিবিরের আশপাশে প্রদক্ষিণ কর, ওৎ পেতে থাক আর সুযোগ বুঝে মুসলমানদের

ক্ষতি সাধন করতে থাক। বরং কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে এটিও জানা যায় যে, তাদের সংখ্যা আশি ছিল আর সুযোগে কুরায়েশ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু যাহোক মুসলমানরা আল্লাহর ফজলে নিজ জায়গায় সজাগ ও সচেতন ছিল। আর কুরায়েশের এই ষড়যন্ত্রের গোমর ফাঁস হয়ে যায় আর এদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। মক্কাবাসীর এমন আচরণে, যা পবিত্র মাসগুলোতে বলতে গেলে হারাম শরীফের ভেতর করা হয়েছিল, মুসলমনরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং শান্তি আলোচনায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দেন নি। মক্কাবাসীর এহেন আচরণের কথা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

هُوَ الَّذِیْ کَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَاَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّةَ
مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ وَکَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا۔

অর্থাৎ মক্কার উপত্যকায় আল্লাহ নিজ কৃপায় কাফেরদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন আর তোমাদের সুরক্ষা করেছেন আর তোমরা যখন তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছ আর তাদেরকে নিজেদের করতলগত করেছ তখন তিনি তাদের থেকে তোমাদের হাতকে বিরত রেখেছেন। (সূরা ফাতাহ্: ২৫)

যাহোক, যখন আমরা এই সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সেই পটভূমিতে মহানবী (সা.)-এর ক্রমাগত ধৈর্য, স্থৈর্য ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, তা এমন এক ধৈর্য ও শান্তি স্থাপনের পরম প্রচেষ্টা ছিল, যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি (সা.) ক্রমাগত এই চেষ্টাই করতে থাকেন যেন শান্তির কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মহানবী (সা.) যখন কুরায়শদের দুষ্কৃতি দেখলেন এবং একই সাথে খিরাশ বিন উমাইয়া-র সাথে মক্কাবাসীদের উত্তেজিত আচরণের কথা শুনলেন, তখন কুরায়শদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনার উদ্দেশ্যে এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করতে চাইলেন, যিনি মক্কারই বাসিন্দা এবং কুরায়শদের কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন। অর্থাৎ এতকিছুর পরও তিনি (সা.) হাল ছেড়ে দেন নি, বরং এত কিছুর পরও অন্য কাউকে পাঠানোর এই ঝুঁকি নেন। সুতরাং তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাবকে বলেন, ভাল হয় যদি আপনি মক্কায় যান এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিকের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উমর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি জানেন যে মক্কার লোকেরা আমার প্রতি তীব্র শত্রুতা রাখে এবং বর্তমানে মক্কায় আমার গোত্রের এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নেই, মক্কাবাসীদের উপর যার চাপ থাকতে পারে। এজন্য আমার পরামর্শ হল, সাফল্যের পথ সুগম করার লক্ষ্যে এই সেবার জন্য উসমান বিন আফফানকে বেছে নেওয়া হোক, যার গোত্র বনু উমাইয়া বর্তমানে অত্যন্ত প্রভাবশালী; আর মক্কাবাসীরা উসমানের বিরুদ্ধে কোন দুষ্কৃতির দুঃসাহস দেখাতে পারবে না এবং হযরত উসমানকে পাঠালে সাফল্যের অধিক আশা করা যায়। এই পরামর্শ মহানবী (সা.) পছন্দ করেন এবং তিনি হযরত উসমানকে মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন যেন কুরায়শদেরকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় ও উমরা পালনের ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি অবগত করেন। আর তিনি (সা.) হযরত উসমানকে নিজের পক্ষ থেকে কুরায়শ-নেতাদের নামে একটি চিঠিও লিখে দেন। এই চিঠিতে মহানবী (সা.) নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং কুরায়শদের নিশ্চয়তা দেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একটি ইবাদত পালন করা আর আমরা শান্তিপূর্ণভাবে উমরা পালন করে ফিরে যাব। তিনি (স.) হযরত ওসমানকে এটিও বলেন, মক্কায় যেসব দুর্বল মুসলমান রয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাতেরও চেষ্টা করো এবং তাদের সাহস ও মনোবল দৃঢ় করো এবং তাদেরকে বলো,তোমরা আরেকটু ধৈর্য ধারণ কর, অচিরেই খোদা তা'লা সাফল্যের দ্বার খুলবেন। এ বার্তা নিয়ে হযরত ওসমান মক্কায় যান এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাত করেন যিনি সে যুগের বড় নেতা ছিলেন এবং হযরত ওসমানের নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) মক্কাবাসীদের এক জনসভায় উপস্থিত হন। সেই সভায় হযরত ওসমান মহানবী (স.)-এর লিখিত পত্র উপস্থাপন করেন যা একে একে কুরাইশদের বিভিন্ন নেতা পৃথক পৃথকভাবেও পড়ে দেখে। তা সত্ত্বেও তাদের সবাই এ হঠকারিতায় অনড় ছিল যে, মুসলমানগণ এবছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত ওসমানের জোর দেওয়ার পর কুরায়েশরা বলল, তোমার যদি বেশী আগ্রহ থাকে তবে আমরা তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ করার সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু এর অধিক নয়। হযরত ওসমান বললেন, এটি কিভাবে হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে মক্কার বাইরে বাধা দেওয়া হবে আর আমি তওয়াফ করব? কিন্তু কুরায়শরা কিছুতেই মানল না। অবশেষে হযরত ওসমান হতাশ হয়ে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তখন মক্কার দুষ্কৃতকারীদের মাথায় যে দুষ্কৃতি ভর করে তা হলো, তারা হযরত ওসমান এবং তার সাথীদের মক্কায় বাধাগ্রস্ত করে সম্ভবত এ ভেবে যে, এভাবে তারা সমঝোতায় অধিক লাভজনক শর্তাবলী চাপিয়ে দিতে পারবে। তখন মুসলমানদের মাঝে এ গুজব রটে যায় যে, মক্কাবাসীরা হযরত ওসমানকে হত্যা করেছে। এ সংবাদ পৌঁছার পর মহানবী (স.)ও গভীরভাবে শোকাহত ও ক্রুদ্ধ হন। তখন তিনি সেখানে বয়াতে রিযওয়ান নেন।

এ সম্পর্কে লেখা আছে, এ সংবাদ হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর মুসলমানদের মাঝে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কেননা উসমান মহানবী (স.)-এর জামাতা এবং সবচেয়ে সম্মানিত সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন। মক্কায় তিনি ইসলামী দূত হিসাবে গিয়েছিলেন। আর সেই দিনগুলোও 'আশহারে হুরুম' অর্থাৎ সম্মাজনক মাস-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মক্কাও হারাম (সম্মানিত)বা পবিত্র এলাকা ছিল। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ সমস্ত মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে একটি বাবলা গাছের নিচে সমবেত করেন। অতঃপর সাহাবাগণ যখন একত্রিত হন তখন এই সংবাদের কথা উল্লেখ করে তিনি (সা.) বলেন, যদি এই সংবাদ সঠিক হয়ে থাকে তবে খোদার কসম! আমরা এই জায়গা হতে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বো না যতক্ষণ উসমানের (হত্যার) প্রতিশোধ না নিই। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, আস এবং আমার হাতে হাত রেখে (অর্থাৎ ইসলামের বয়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুযায়ী) এই অঙ্গীকার কর যে, তোমাদের কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না এবং নিজ জীবন বাজি রেখে লড়াই করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিজ স্থান ত্যাগ করবে না। এই ঘোষণার পর সাহাবাগণ বয়'আতের জন্য এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যে একে-অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন। এই ১৪০০-১৫০০ মুসলমানের প্রত্যেকেই নিজ প্রিয় মনিবের হাতে পুণরায় বয়'আত করে বিক্রি হয়ে যায়; সে সময় ইসলামের সামগ্রিক পুঁজি এটিই ছিল; অর্থাৎ এটিই মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল। যখন বয়'আত নেওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি (সা.) তাঁর বাম হাত তাঁর ডান হাতের ওপরে রেখে বলেন, এটি উসমানের হাত। কেননা যদি সে এখানে উপস্থিত থাকতো তবে এই পবিত্র বাণিজ্যে অন্যের চেয়ে পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু এখন সে খোদা ও তাঁর রাসূলের কাজে নিয়োজিত। এভাবেই বিদ্যুত তুল্য এই দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটে।

ইসলামের ইতিহাসে এই বয়'আত 'বয়'আতে রিযওয়ান' নামে সু-প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই বয়'আত যেখানে মুসলমানগণ খোদা তা'লার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের পুরস্কার লাভ করেছেন। কুরআন শরীফও বিশেষভাবে এই বয়'আতের কথা উল্লেখ করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یُبَایِعُوْنَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِیْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیْبًا

অর্থাৎ হে রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়আত করছিল। কেননা এই বয়আতের মাধ্যমে তাদের অন্তরের সুপ্ত নিষ্ঠা আল্লাহ তা'লার প্রকাশ্য জ্ঞানের অংশ হয়ে গেছে। সুতরাং খোদাও তাদের অন্তরে শান্তি বর্ষণ করেন আর তাদের তিনি এক নিকটবর্তী বিজয়ে ধন্য করেন। (সূরা ফাতাহ, আয়াত: ১৯)

সাহাবা (রা.)ও এই বয়আতের কথা সর্বদা অত্যন্ত গর্ব ও আবেগের সাথে বর্ণনা করতেন এবং তাদের অধিকাংশরাই পরবর্তীতে যুগের লোকদের বলতেন, তোমরা তো মক্কা বিজয়কে বিজয় মনে কর, কিন্তু আমরা বয়আতে রিজওয়ানকেই প্রকৃত বিজয় মনে করতাম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই বয়াতের সমূহ অনুষঙ্গ ও শর্তের বর্তমানে এক অতি মহান বিজয় ছিল। শুধু এজন্য নয় যে, এটি ভবিষ্যতের অন্যান্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেছে, বরং এজন্যেও যে, এর মাধ্যমে ইসলামের সেই প্রাণ বিকিয়ে দেওয়ার চেতনার অতি মহান রূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা কিনা মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু আর ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ মান্যকারীরা তাদের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা তাদের রসূল এবং এই রসূল (সা.)-এর আনিত সত্যের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আর সেই (রণ)ক্ষেত্রের প্রত্যেক ধাপে জীবন ও মৃত্যুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বয়আতে রিজওয়ানের কথা উল্লেখ করে বলতেন, এই বয়আত ছিল মৃত্যুকে বরণ করার (স্বীকৃতিস্বরূপ) বয়আত। অর্থাৎ এই অঙ্গীকারের ওপর বয়আত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মুসলমান ইসলামের জন্য এবং ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের জীবন বাজি রাখবে তথাপি তারা পিছু হটবে না। এই বয়আতের বিশেষ দিকটি হলো, এই অঙ্গীকার ও শপথ কেবল মৌখিক কোন সাময়িক স্বীকৃতি ছিল না, যা কোন সাময়িক উত্তেজনার বশে করা হয়, বরং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উদ্ভূত ধ্বনি ছিল যার পেছনে মুসলমানদের

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

নবাগত আহমদীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

একজন অতিথি বলেন, আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যদি কোন সমস্যা থাকে, আমি তা দূর করার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, সততার সঙ্গে নাগরিকদের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করাই সততার দাবি। এমনটি করলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হবেন।

এক নবাগত আহমদী বলেন, 'আমি কালই বয়আত করে জামাতে এসেছি। আহমদীদের 'শাফায়াত' কে করবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'শাফাআত' এর অধিকার আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.) কে দিয়েছেন। আহমদী, মুসলমান যদি পুণ্যবান হয়, কুরআন নির্দেশিত আদেশ পালনকারী হয়, আঁ হযরত (সা.)-এর আদেশ মান্যকারী হয় তবে সেটাই হল পুণ্যকর্ম। এগুলি এবং অন্যান্য পুণ্যকর্মসমূহ মানুষকে জান্নাতের অধিকারী করে।

তাছাড়া 'শাফায়াত'-এর অধিকার কেবল নবী করীম (সা.)-এর কাছে আছে আর তা তিনি করবেন আল্লাহ্র আদেশে। আমরা আঁ হযরত (সা.)কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করি। হযরত আদকস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'আমি তো আঁ হযরত (সা.)-এর দাস হিসেবে এসেছি। আমি যে সম্মান লাভ করেছি তা আঁ হযরত (সা.)এর দাসত্বেই। আমি সব কিছু তাঁর কল্যাণেই লাভ করেছি।'

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, না কোন মৌলবী শাফায়াত করতে পারে না কোন খাজা বা সৈয়্যদ শাফায়াত করতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল বলতেন, এক পীর সৈয়্যদ ছিল। সে মহিলাকে বলল, তুমি পাপ করে এসেছ। আমি সৈয়্যদ, নবী করীম (সা.)-এর বংশধর। অতএব আমি তোমার শাফাআত করব। যদি খোদা তোমাকে প্রশ্ন করেন, তুমি বলো, 'আমি এক এমন পীরের শিষ্যা যিনি সৈয়্যদ বংশের। নবী করীম (সা.) কত যাতনা সহন করেছেন। একথা শুনে খোদা তোমাকে জান্নাতে দিবেন। আর যখন আমি আসব, তখন আল্লাহকে বলব, আমি সৈয়্যদ, নবী করীম (সা.)-এর বংশধর। আল্লাহ্ আমাকেও জান্নাতে দিবেন। এই হল তাদের কথাবার্তা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদা কোন পীর, খাজা, সৈয়্যদ বা মৌলবীকে শাফাআতের অধিকার দেন নি। মানুষকে নিজের কর্মের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত এবং আল্লাহর কৃপা যাচনা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, আল্লাহ্র আদেশ ব্যাতিরেকে কাউকে শাফাআতের অধিকার দেওয়া হয় নি।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক নিষ্ঠাবান সাহাবীর ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়। প্রায় মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) তার সুস্থতার জন্য দোয়া করেন যে, 'খোদা তা'লা যেন তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তাঁর এই দোয়া কবুল হয় নি। এতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, যদি দোয়া কবুল না হয় তবে আমার শাফায়াত কবুল কর। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম হল, আমার আদেশ ব্যতিরেকে কে আছে যে শাফাআত করতে পারে?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এমন প্রবলভাবে এই ইলহাম হয় যে, আমি কেঁপে উঠি আর খোদার দরবারে ইসতেগফার করি। এরপর খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম হয় যে তোমাকে আদেশ করা হল। অতএব খোদার আদেশে তিনি শাফাআত করলে সেই ছেলেটি সুস্থ্য হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করেন। তখন তিনি অন্যান্য প্রিয়ভাজনদেরও আদেশ দিলে তারা শাফাআত করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ হল শর্ত।

কাজেই শাফাআতের প্রকৃত আদেশ ও অনুমতি আল্লাহ্ তা'লা কেবল নবী করীম (সা.)কে দিয়েছেন, অন্য কাউকে উম্মতের হয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেন নি। তাই আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তাই কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে, অন্য কেউ নয়।

প্রশ্নকর্তা বলেন, হুযুরের কথাগুলি আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করছে। মনে হচ্ছে যেন আমি কাঁদতে শুরু করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়বেন। তিনি কুরআন করীম, আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী ও শিক্ষা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করেন নি। এটিই আসল সত্য। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আরও বেশি নিষ্ঠা দিন, জামাতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি দান করুন এবং নিজ কৃপায় ধন্য করুন।

সাবীলা নামে এক আহমদী কিশোরী জলসার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি নযম অনুশীলন করেছিল। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উর্দুতে সুললিত কণ্ঠে সেই নযমটি সে পরিবেশন করে। নযমটি হল-

ওহ দেখতা হ্যা গ্যায়রোঁ সে কিঁউ
দিল লাগাতে হো/ জো কুছ বুতোঁ
মেঁ পাতে হো, উসমে ওহ কিয়া
নেহিঁ।

মেসিডোনিয়া থেকে আগত এক দম্পতি কিকার্সি জর্ডান এবং ইডিজা সাহেবা নিজেদের আবেগ অনুভূতির কথা বর্ণনা করে বলেন, 'আমরা তৃতীয় বার জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। এখন আমরা নিজেদেরকে জামাতের অংশ হিসেবে মনে করি। জলসার পরিবেশ আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এখানে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ রয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আগামী জলসায় অংশগ্রহণ করতে চাইব। খলীফার বক্তব্যগুলি শুনে প্রভাবিত হয়েছি। বিশেষ করে যেভাবে তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চাইছিলেন তা খুবই ভাল পদ্ধতি ছিল।'

গোরান সিতাম বোলসিকি নামে এক অতিথি বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা উন্নত মানের ছিল। বিশেষ করে জলসার প্রধান সভাগৃহে যে অনুষ্ঠান হয়েছে তা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে। পুরো ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়েছে। জামাতের সদস্যদের আচররণ থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল যে তারা নিজেদের খলীফাকে কতটা ভালবাসে। এই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আমাকে অবাক করেছে। এই সব বিষয় আমরা মেসিডোনিয়া গিয়ে নিজেদের পরিচিতদেরকে জানাব।

কিরোদী মাত্রোস্কি নামে এক মেসিডোনিয়ান ভদ্রলোক বলেন,

'আমি আপনাদের জামাত দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত; জীবনে এই প্রথম এত সব ভদ্রমানুষের সঙ্গে আলাপ করলাম। ইসলামের বাণী আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে যা এখানে এসে পেয়েছি। এখানে দেওয়ালে যে বাণী লেখা আছে (ব্যানার) সেগুলি কেবল কথা নয়, বরং বাস্তবেই আপনারা সেগুলি মেনে চলেন। আপনারা মানুষকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন এবং শান্তি প্রদর্শন করেন। এই বিষয়গুলি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

মেসেডোনিয়ার একজন অতিথি ইরথ নাজাত সাহেব বলেন, জলসার বক্তব্যগুলি বেশ ভাল ছিল, যেগুলির সারাংশ হল শান্তি, অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক ভালবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। জামাত আহমদীয়া প্রত্যেক মানুষকে শান্তি ও ভালবাসা দেয় তা চোখেই পড়ে। এই জামাত কাউকে ঘৃণা করে না। এই সকলকে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। ইসলামী শিক্ষাও একথা বলে যে সকলকে সম্মান করা উচিত।

জুলিয়া কনিষ্কা সাহেবা বলেন, 'হুযুরকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। খলীফা যেভাবে আমাদের অভিবাদন জানালেন তা আমাকে অবাক করেছে। আমি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখেও আশ্চর্য হয়েছি। তিনি বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, তাঁর মধ্যে সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা অসাধারণ বিষয় ছিল; তাও আবার এমন সব প্রশ্ন , ডাক্তাররা পর্যন্ত যেগুলির উত্তর দিতে হিমসিম খেয়ে যায়। খলীফার সব দিক থেকে আমাদের বিষয়ে যত্নবান থেকেছেন এবং আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

তিনি বলেন, আমি সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করি। আমি বলতে চাই যে এই জলসা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের একত্রিত করেছে। ধর্মীয় দিক থেকে আমি খৃষ্টান, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কদিন আমি ভাল অনুভব করছি, আমি বেশ আনন্দিত। এই ধরণের অনুষ্ঠানে আমি প্রথম অংশ গ্রহণ করছি। আমার এই প্রথম এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে যেখানে সকলের বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়। আমি এখানে থাকতে পেরে বেশ আনন্দিত। আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

টনি এওতাস্কি নামে এক অতিথি বলেন: আমি পেশায় একজন সাংবাদিক। এবছর জলসায় আসতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। আমার জন্য এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সাংবাদিক হওয়ার কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু এটিই ছিল সব থেকে ভাল অনুষ্ঠান। অনেক মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে; সব কিছুর সম্পাদনা সুষ্ঠ ও সুচারু ছিল। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা এখানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি একথা জেনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি যে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সকলে সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সহিষ্ণুতা আছে। ধর্মীয়. জাতি এবং ভাষাগত কোন বিবাদ নেই। একজন অমুসলিম হিসেবে একথাটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- আপনাদের এই বার্তা মানবজাতিকে ঐক্যবন্ধ করতে পারে আর এরই মাধ্যমে মানবতা বজায় থাকতে পারে। এই মোট্টো আমার পছন্দ হয়েছে। আপনাদের ভবিষ্যতের সফলতার জন্য শুভেচ্ছা রইল।

আরও একজন অতিথি আকি আকিওভ সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে প্রভাবিত হয়েছি আর আমার প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। আমি একজন মুসলমান আর এখন জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।

সাবিনা রামাডানোভা নামে এক অতিথি বলেন, আমি প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। জলসার সর্বপ্রথম যে প্রভাব আমার পড়েছে তা হল জামাতের সেই কর্মীদের যারা সেখানে কর্মরত ছিল; তারা প্রত্যেকের প্রতি যত্নবান ছিল। অতিথিদের দারুণ আপ্যায়ন করা হয়েছে। থাকার ব্যবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু থাকার জায়গা জলসাগাহ থেকে দূরে ছিল আর আমাদেরকে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। থাকার জায়গা জলসাগাহ এর কাছাকাছি হলে গরমে এমন নাজেহাল হতে হত না আর বক্তব্যগুলি আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারতাম, আমরা এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম না। কেননা সভাগৃহে আসার পর আমরা ভাবছিলাম ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে নিব।

তিনি বলেন, যারা জলসায় প্রথম বার আসেন, তাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং তাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তারা প্রথমে ইসলামের সঙ্গো পরিচিত হোক এরপর তাদেরকে আরও স্পষ্ট করে বোঝানো উচিত যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

দারাগান জার্গিভ সাহেব নামে এক অতিথি বলেন:

আমি প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করলাম। এখানে সব কিছু চমৎকার ছিল। প্রচুর মানুষ একত্রিত হয়েছিল। মুসলমানদের সঙ্গো এই প্রথম আমার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। আর আমি এমন সব বক্তব্য শুনেছি যা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে ছিল। এখানে মুসলমানেরা এমনভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল যেন তারা আমাদের বহু পরিচিত। জলসা অতি উৎকৃষ্ট মানের একটি আয়োজন ছিল। এত মানুষের যথাসময়ে যাবতীয় চাহিদাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে- খাওয়া-দাওয়া, সব কিছু। সুযোগ পেলে আমি জলসায় আবার অবশ্যই আসব।

জ্যাকলিনা নামে আরেক অতিথি বলেন- 'জলসার আয়োজন অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষ দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত মানের ছিল। হুযুরের বক্তব্য এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যগুলিও খুব ভাল ছিল।হুযুরের সঙ্গো সাক্ষাত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছি। আমি কৃতজ্ঞ যে হুযুর আমাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছেন এবং তাঁর সময়ের মধ্য থেকে আমাদেরকে কিছুটা দিয়েছেন। সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। যারা সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিল, সকলে হুযুরের উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়েছে আর হুযুরের পক্ষ থেকে সম্মান লাভ হওয়াই সকলে সন্তুষ্ট হয়েছে।

আরবেন ফেজুলাই সাহেব বলেন- আমি জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করছি, আমার জন্য সব কিছু নতুন ছিল। আমার জানা ছিল না যে ইসলামে এমন জামাতও আছে। এই জলসায় অংশগ্রহণ করার পর আমার জ্ঞানের স্তর যেন অন্য মাত্রা ছুঁয়েছে বলে অনুভব করছি। আহমদীয়াত সম্পর্কে আমি বেশি জেনেছি আর এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও হয়েছে। মনে হচ্ছিল যেন আমি এই জামাতেরই অংশ। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের একত্রিত হওয়া এবং সকলের চাহিদার বিষয়ে যত্নবান থাকা অনেক বড় কাজ।

আমি যখন হুযুরের বক্তব্য শুনছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল এরা কিভাবে পরস্পরকে ভালবাসে! একে অপরকে সম্মান দেয় কারো ক্ষতি হোক তা চায় না! আজ সাক্ষাতের সময় যা কিছু আমি হুযুরের কাছ থেকে শুনেছি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করব যে আমাদের এবং আহমদীদের মাঝে পার্থক্য কি? যা কিছু হুযুরের কাছে শুনলাম তা খুব ভাল লাগল। জামাতের জন্য আমার বার্তা হল, আমার দেশ এবং অন্যান্য দেশে যেখানে যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে আহমদীয়াত এর মিশনারী পাঠানো হোক যারা সেখানে মানুষকে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দিবে।

মোনে ইউভানোভ সাহেব বলেন, আমি জলসায় অংশগ্রহণ করে এর স্মৃতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। জলসার ব্যবস্থাপনার কাজ এমন যা যে কোন সংগঠনের পক্ষে পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন। বরং আমি তো বলব, একটি বড় দেশও এই মানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে না। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। জলসার পরিবেশ, এর পরিকল্পনা, আয়োজন সব কিছু নিখুঁত এবং সুন্দর ছিল। বক্তব্যগুলি ছিল জ্ঞানগর্ভ। জলসার বার্তা ছিল বিশ্বজনীন- অর্থাৎ সমগ্র জগতের কল্যাণ।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গো সাক্ষাত ছিল বেশ আকর্ষণীয়। তিনি সকলের কথা শান্ত হয়ে ও ধৈর্য্যসহকারে শুনেছেন এবং সেগুলির উত্তর দিয়েছেন।

বোসনিয়ান অতিথিদলের সঙ্গো সাক্ষাত

এবছর বোসনিয়া থেকে ৪৭জন সদস্যের একটি দল জলসা সালনা জার্মানীতে অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্য তবলীগাধীন অতিথিরা ছিলেন। হুযুর আনোয়ার দলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন যে জলসা কেমন কেটেছে? অতিথিরা অকপটে স্বীকার করেছে যে, জলসা খুব ভাল কেটেছে আর সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুব ভাল ছিল, প্রতিটি বস্তু সুব্যবস্থিত ছিল।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'জলসায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমি হুযুরের সমস্ত বক্তব্য শুনেছি। আমার ভাবাবেগ ব্যক্ত করার ভাষা হারিয়ে ফেলছি।

ভদ্রমহিলা তার বোনের জন্য দোয়ার আবেদন করে বলেন, 'সে অসুস্থ, পরিবারে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে।

হুযুর আনোয়ার বলে, 'আল্লাহ্ কৃপা করুন।'

এক ভদ্রমহিলা বলেন, 'এখন আমি হুযুরের সামনে আছি, যিনি এক মহান সত্তা। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এই কারণে যে সকলের অনেক যত্ন নেওয়া হয়েছে। হুযুরের বক্তব্য খুব ভাল ছিল আর আমাদেরকে তা প্রভাবিত করেছে।

জায়নাবা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমরা নিজের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করলাম। অনেক তথ্য

১ম পাতার শেষাংশ.....

মানুষের উপর একটা সীমা পর্যন্ত বল প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দিয়ে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকে কিম্বা নামায ত্যাগকারী হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে তার কারণে যেহেতু জামাতের সুনাম হানি হয়, তাই আমাদের অধিকার বর্তায় এমন ব্যক্তির সংশোধনের জন্য তাকে বাধ্য করা। তবে যদি সে আহমদীয়াতকেই অস্বীকার করে এর থেকে পৃথক হয়ে যায় কিম্বা নিজের কোন নতুন জামাত গঠন করে, তবে তার উপর আমাদের কোন অধিকার বর্তাবে না। মোটকথা, أَنْتُمْ بَرِيْئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ আয়াতে বলা হয়েছে যে আমার এবং তোমাদের জামাত ভিন্ন ভিন্ন। আমার কাজের দায় তোমাদের উপর বর্তাবে না, তাই বলপ্রয়োগ বা বিবাদের কোন কারণ নেই।

এই আয়াতের এই অর্থও আছে যে, আমার এবং তোমাদের কর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। পরিণামই বলে দিবে যে, কার কর্ম সঠিক এবং সে খোদার নিকট গ্রহণীয়। কর্মধারা সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বলা যাবে না যে উন্নতি বা অবনতি কি কারণে হয়েছে। কিন্তু যখন কোন সাদৃশ্যই থাকবে না, তখন তৎক্ষণাৎ বোঝা যাবে যে এই পরিণাম উদ্ভূত সেই জাতির বিশেষ কর্ম থেকে। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮২)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 18-25 March, 2021 Issue No.11-12

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সম্মিলিত শক্তি এক বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল।

কুরাইশরা যখন এই বয়আত সম্বন্ধে জানতে পারে, তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা শুধু হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের মুক্ত করেই ক্ষান্ত হয় নি। বরং তাদের দূতদেরও এ নির্দেশনা প্রদান করে যে, এখন যে করেই হোক, মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে নেওয়া উচিত, কিন্তু এ শর্ত অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে, মুসলমানরা যেন এ বছরের পরিবর্তে আগামী বছর এসে উমরা করে আর এখন যেন ফিরে যায়। অপরদিকে মহানবী (সা.)ও শুরু থেকেই এই অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন যে, এ অবস্থায় আমি এমন কোন কথা বলবো না, যা মহর্‌রম মাসের পবিত্রতা এবং কাবা গৃহের সম্মান পরিপন্থী হবে আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যেহেতু এ সুসংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, এ অবস্থায় কুরাইশদের সাথে শান্তিচুক্তি ভবিষ্যত সফলতার পথ সুগম করবে, তাই এই উভয় পক্ষের জন্য যেন এ পরিবেশ সন্ধি ও মীমাংসার এক অতি উত্তম পরিবেশ ছিল আর এ পরিবেশেই সোহেল বিন আমর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। আর মহানবী (সা.) তাকে দেখেই বলেন, এখন মনে হচ্ছে বিষয়টি সহজ হবে। সন্ধির আলোচনা শুরু হলে সোহেল বিন আমর যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে তখন তিনি (সা.) তাকে দেখেই বলেন, (যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে,) সোহেল আসছে, আল্লাহ্ চাইলে এখন বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে। যাহোক সোহেল এসেই মহানবী (সা.)কে বলে, চলুন! এখন দীর্ঘ বিতর্ক বাদ দিন, আমরা চুক্তি করতে প্রস্তুত আছি। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমরাও প্রস্তুত আছি। একথা বলেই তিনি (সা.) তাঁর সেক্রেটারী হযরত আলী (রা.)কে ডেকে পাঠান। এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ :-

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এ বছর ফিরে যাবেন। আগামী বছর তারা মক্কায় এসে উমরার আচারঅনুষ্ঠান পালন করতে পারবে, কিন্তু শর্ত হলো সাথে খাপবন্দি তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং মক্কায় তিন দিনের অধিক সময় অবস্থান করবে না।

মক্কার লোকদের মধ্যে থেকে কেউ যদি মদীনায় যায় তাহলে সে মুসলমান হলেও মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় আশ্রয় দিবেন না এবং তাকে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু কোন মুসলমান যদি মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মক্কার কেউ যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মদীনায় আসে তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে থেকে কোন গোত্র চাইলে মুসলমানদের সাথেও মৈত্রী গড়তে পারে কিংবা মক্কাবাসীর মিত্রও হতে পারবে। বর্তমানে এই চুক্তি দশ বছরের জন্য হবে আর এই সময়কালে কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই চুক্তির দুটি অনুলিপি করা হয় আর দুই পক্ষের বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের মাঝে যারা স্বাক্ষর করেন তারা হলেন, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, (ততক্ষণে তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসেছিলেন। অর্থাৎ কাফেররা যে তাকে আটকে রেখেছিল সেখান থেকে ততক্ষণে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তিনিও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।) আব্দুর রহমান বিন অওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবু উবায়দা (রা.)। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সোহেল বিন আমর চুক্তিপত্রের একটি প্রতিলিপি নিয়ে মক্কায় ফিরে যায় এবং দ্বিতীয় প্রতিলিপিটি থাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৭৪৯-৭৬৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন, আশেপাশের কিছু লোক মক্কাবাসীদের কাছে জোর দিয়ে বলে যে, এই মানুষগুলো শুধু তোয়াফ করার জন্য এসেছেন, আপনারা তাদেরকে কেন বাধা দিচ্ছেন? কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদের হঠকারিতায় অনড় থাকে। এতে বাইরের গোত্রগুলোর লোকেরা মক্কাবাসীকে বলে, আপনাদের এ পন্থা বলে দিচ্ছে যে, আপনাদের উদ্দেশ্য সন্ধি নয় বরং দুষ্টামী। এজন্য আমরা আপনাদের পক্ষ নিতে প্রস্তুত নই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে কথাটি বলেছেন তা একটি নতুন কথা। অর্থাৎ আশপাশের গোত্রগুলোর পক্ষ থেকেও চাপ ছিল যার ফলে মক্কাবাসীরা ভয় পেয়ে যায় আর তারা এবিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে যে, মুসলমানদের সাথে আমরা সন্ধি করার চেষ্টা করব। এ বিষয়ের সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) কে, মক্কাবাসীর সাথে আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন যিনি পরবর্তীতে তাঁর তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন । হযরত উসমান (রা.) যখন মক্কায় পৌঁছান তখন মক্কায় যেহেতু তার অনেক অত্মীয়স্বজন ছিল,তারা আত্মীয়রা তার চতুপার্শ্বে সমবেত হয় এবং তাকে বলে, আপনি তাওয়াফ করতে পারেন তবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আগামী বছর এসে তাওয়াফ করবেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি আমার সম্মানিত নেতাকে ছাড়া তাওয়াফ করতে পারব না। যেহেতু মক্কার সর্দারদের সাথে তার আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, তাই কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির লোক মাক্কায় এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করা হয়েছে। ছড়াতে ছড়াতে এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের একত্র করেন এবং বলেন, প্রত্যেক জাতির নিকটই দূতের জীবন নিরাপদ থাকে। তোমরা নিশ্চয় শুনেছ যে, মক্কাবাসী হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করেছে। এই সংবাদ যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা জোরপূর্বক মক্কাতে প্রবেশ করব। অর্থাৎ আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছা ছিল, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মক্কাতে প্রবেশ করব, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে সেই ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছিল সেই পরিস্থিতি যেহেতু বদলে গেছে তাই আমরা এই পরিকল্পনার অনুসরণে বাধ্য থাকব না। যারা এই অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত যে, যদি আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয় তাহলে হয় (মক্কা) জয় করে ফিরব নয়তো একেক করে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করব, তারা এই শপথ করে আমার হাতে বয়আত করুক। মহানবী (সা.) এ ঘোষণা দিতেই তাঁর সাথে আগত সেই পনের শ' দর্শনাথীর সবাই এক মুহূর্তেই পনের শ' সৈনিকে পরিণত হয় এবং উন্মাদপ্রায় হয়ে একে অপরকে টপকে গিয়ে তারা একজন আরেকজনের পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বয়আত করতে সচেষ্ট হয়। পুরো ইসলামী ইতিহাসেই এ বয়আত অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে আর একে বৃক্ষের চুক্তি বলা হয়। কেননা এই বয়আত যখন নেওয়া হয় তখন রসূল করীম (সা.) একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। এই বয়আতে অংশ নেওয়া শেষ ব্যক্তিটিও যতদিন পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি গর্বের সাথে একথাটি স্মরণ করতেন। কেননা পনের শত মানুষের একজনও এই অঙ্গীকার করতে দ্বিধা করে নি। শত্রুরা যদি ইসলামের দূতকে হত্যা করে থাকে তাহলে আজ আমরা দুটি অবস্থার একটি অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি করব। অর্থাৎ হয় তারা সন্ধ্যার পূর্বেই মক্কা বিজয় করবে নয়তো তারা সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিবে। কিন্তু মুসলমানরা তখন সবেমাত্র বয়আত করে শেষ করেছিল, এমন সময় হযরত উসমান (রা.) ফিরে এসে বলেন, মক্কাবাসীরা তো এ বছর উমরা করার অনুমতি দিবে না, কিন্তু আগামী বছরের জন্য অনুমতি দিতে প্রস্তুত। কাজেই এ বিষয়ে চুক্তি করার জন্য তারা তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে। হযরত উসমান (রা.)-এর আগমনের কিছুক্ষণ পরই সন্ধির উদ্দেশ্যে সোহেল নামের মক্কার এক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং এই চুক্তিপত্র লিখা হয়।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৭-৩০৮)

হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে আলোচনা চলমান থাকবে, ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। পাকিস্তানের পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। এখন তারা তো ঘরের চার দেয়ালেও নিরাপদ নয়, নিজ গণ্ডিতেও নিরাপদ নয়। মৌলভীরা যেখানেই বলে, পুলিশের লোক সেখানেই পৌঁছে যায়। এমন কিছু ভদ্র পুলিশও আছে যারা বলে, আমাদের সহানুভূতি আপনাদের সাথে রয়েছে, কিন্তু আমরা কী আর করতে পারি! কেননা আমাদের ওপর এতটা চাপ প্রয়োগ করা হয় যে, আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যা বলে তা-ই আমাদের করতে হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এসব দুষ্ট প্রকৃতির কর্মকর্তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন, দেশকে নিষ্কৃতি দিন আর প্রত্যেক আহমদীকে স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তার সাথে নিজ মাতৃভূমিতে বসবাসের তৌফিক দিন। বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকুন। এ দোয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা খুব শীঘ্রই আমরা দেখব যে, বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক হবে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিকও দিন এবং তা কবুলও করুন।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir